জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

আগস্ট ২০২৩ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড
ষড়যন্ত্রকারী কারা?

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত কলস/মাটির জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ায় ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট ২০২৩ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০

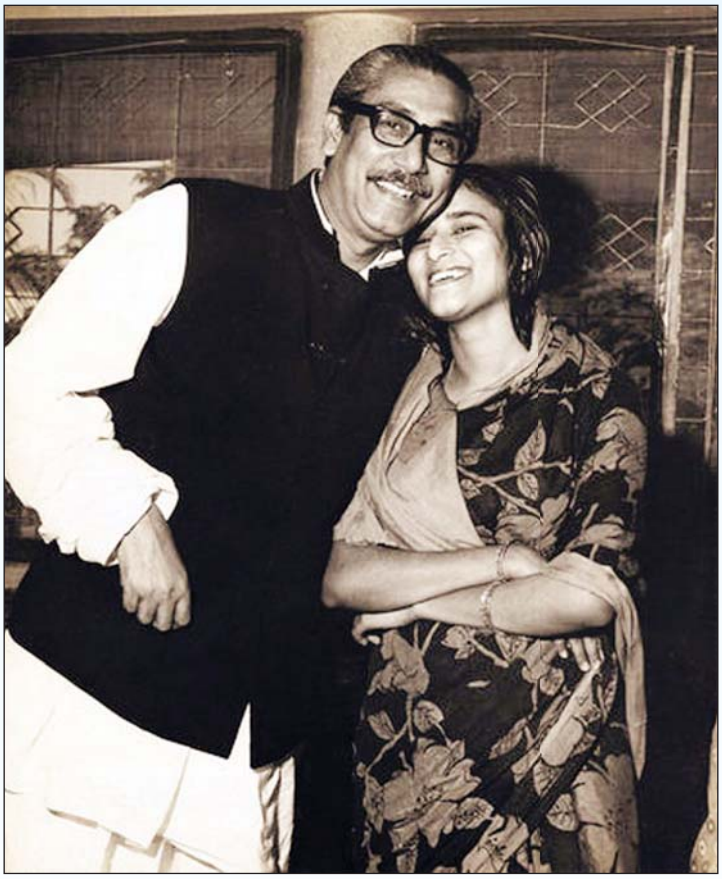

বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্যে শেখ হাসিনা

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। ১৯৭৫ সালের এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক কতিপয় সেনাসদস্য পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালায়। বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা– বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় রক্ষা পান। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠন, উন্নয়ন এবং বিশ্বসভায় দেশকে এগিয়ে নিতে ব্যাপৃত, তখনই স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রে সক্রিয় হয়ে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটায়। অথচ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তিনি বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি, স্মরণ করি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে *সচিত্র বাংলাদেশ* বিশেষ সংখ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র 'বেদনায় ভরা দিন' শিরোনামের একটি নিবন্ধ রয়েছে। এছাড়া আছে খ্যাতিমান অধ্যাপক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প এবং কবিতা।

৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার ৯৩তম জন্মবার্ষিকী। দিবসটি জাতীয়ভাবে পালিত হয়। বেগম মুজিব বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বদা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, দূরদর্শী চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছেন। মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার স্মরণে রয়েছে নিবন্ধ।

এ মাসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁদের স্মরণে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

আশা করি, বিশেষ সংখ্যার লেখাগুলো পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গ্রন্থ আলোচনা

বেদনায় ভরা দিন ৩
শেখ হাসিনা

শেখ মুজিবুর রহমান: বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু ৬
মোনায়েম সরকার

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড: ষড়যন্ত্রকারী কারা? ৮
হারুন রশীদ

জাতির পিতা ও চ্যান্সেলর হত্যার বিচার ১০
জাফর ওয়াজেদ

জাতীয় শোক দিবস: ফিরে দেখা ১২
খালেক বিন জয়েনউদদীন

নজরুলের ছিন্ন তরণী ১৪
প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশচিন্তা ও স্মার্ট বাংলাদেশ ১৭
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুভাবনা ২০
ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ২৩
কামরুন নাহার মুকুল

রবীন্দ্র-গানে ফুল ২৬
ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

বাইগার পারের বাঙালি:
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুণাবলির নাট্য-আখ্যান ২৯
শফিকুল ইসলাম

নজরুলের ধূমকেতু: অমৃত সম্পদ ৩২
পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

বঙ্গবন্ধুর পরিবার ক্রীড়াঙ্গনের বাতিঘর ৩৫
শামসুজ্জামান শামস

মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ৪১
শেলী সেলিনা

আশ্রয়ণে পুনর্বাসিত পরিবারের পুষ্টি ভাবনা ৪৭
মো. আবদুর রহমান

প্রযুক্তির দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে ডাকবাক্স ৪৯
ডা. নূরল হক

দুর্গম পাহাড়ে সোলার প্যানেলের ডিজিটাল আলো ৫২
মো. রেজুয়ান খান

রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুটি রেকর্ড ৫৪
উষা রানী রায়

যুব উন্নয়নে সরকারের নানামুখী কর্মসূচি ৫৮
ইসমত আরা

মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই ৬০
জাহানারা বেগম

গল্প

আন্ধারমানিকে ডুব সাঁতার ৩৮
সেলিনা হোসেন

দুঃখিনী দুই রাজকন্যা ৪৩
সুজন বড়ুয়া

কবিতাগুচ্ছ ৫০-৫১, ৫৬-৫৭, ৬২-৬৩

বিশেষ প্রতিবেদন ৬৪-৭৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন অধ্যাপিকা পান্না কায়সার ৭৯

বেদনায় ভরা দিন

শেখ হাসিনা

রোড ৩২, ধানমন্ডি

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এমন সময় প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। এ গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ি ঘিরে, যে বাড়িতে বসবাস করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক বিঘা জমির উপর খুবই সাধারণ মানের ছোট্ট একটা বাড়ি। মধ্যবিত্ত মানুষের মতই সেখানে বসবাস করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সবসময়ই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এই বাড়ি থেকেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন-সংগ্রাম এই বাড়িটি তার নীরব সাক্ষী। সেই বাড়িটিই হলো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে আজানের ধ্বনি হারিয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নিরাপত্তায় সাধারণত সেনাবাহিনীর ইনফেন্ট্রি ডিভিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ১০-১২ দিন পূর্বে বেঙ্গল ল্যাঞ্চারের অফিসার ও সৈনিকদের এ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার মা, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, লক্ষ করলেন কালো পোশাকধারী সৈনিকেরা বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত। তিনি প্রশ্নটা তুলেছিলেনও। কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি।

আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল দেশের মানুষের প্রতি অঢেল ভালোবাসা। তিনি সকলকেই অন্ধের মত বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনও এটা ভাবতেও পারেননি যে, কোন বাঙালি তাঁর ওপর গুলি চালাতে পারে বা তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাঁকে বাঙালি কখনও মারবে না, ক্ষতি করবে না এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই বিশ্বাসের কি মূল্য তিনি পেয়েছিলেন?

চারদিকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। বিকট শব্দে মেশিনগান হতে গুলি করতে করতে মিলিটারি গাড়ি এসে দাঁড়ালো ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে। গুলির আওয়াজে ততক্ষণে বাড়ির সকলেই জেগে উঠেছে। আমার ভাই শেখ কামাল দ্রুত নীচে নেমে গেল রিসেপশন রুমে - কারা আক্রমণ করলো, কী ঘটনা জানতে। বাবার ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কামাল বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখে বাড়ির গেট দিয়ে মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদা এগিয়ে আসছে। কামাল তাদের দেখেই বলতে শুরু করলো: আপনারা এসে গেছেন, দেখেন তো কারা বাড়ি আক্রমণ করলো?

ওর কথা শেষ হতে পারলো না। তাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। কামাল সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর নূর আর কামাল একইসঙ্গে কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আর সেই কারণে ওরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনতো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সে চেনা মানুষগুলি কেমন অচেনা ঘাতকের চেহারায় আবির্ভূত হলো। নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করলো সহযোদ্ধা কামালকে। কামাল তো মুক্তিযোদ্ধা। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যায় যুদ্ধ করতে। এরপর বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে।

মেজর সৈয়দ ফারুক ট্যাংক নিয়ে আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আব্বা সবার আগে ঘর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহ সাহেবকে ফোন করেন। তাঁকে জানান বাড়ি আক্রান্ত। তিনি জবাব দেন: আমি দেখছি। আপনি পারলে বাইরে কোথাও চলে যান।

এর মধ্যে ফোন বেজে ওঠে। কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, আমার সেজ ফুফা, ফোনে জানান যে তাঁর বাড়ি কারা যেন আক্রমণ করেছে। আব্বা জবাব দেন তাঁর বাড়িও আক্রান্ত। আব্বা আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ফোন করেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন: লিডার দেখি কী করা যায়। আব্দুর রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ ফোনে বলেন: আমি দেখছি। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে থাকেন: আমি কী করবো? তোফায়েল আহমেদ রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। আব্বা নীচে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। মা পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দেন। আব্বা যেতে যেতে- কামাল কোথায়– জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কথা বলতে বলতে তিনি সিঁড়ির কাছে পৌঁছান ।

এ সময় সিঁড়ির মাঝের প্ল্যাটফর্মে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও দোতলায় উঠে আসছিল। এদের মধ্যে হুদাকে চিনতে পারেন আব্বা। আব্বা তার বাবার নাম ধরে বলেন: তুমি রিয়াজের ছেলে না? কী চাস তোরা? কথা শেষ করতে না করতেই গর্জে উঠে ওদের হাতের অস্ত্র। তাদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগ দিয়েছিল রিসালদার মোসলেউদ্দিন।

ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়লেন আব্বা। আমার মা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘাতকের দল ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। আমার মাকে তারা বাধা দিল এবং বললো যে আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। মা বললেন: আমি এক পা-ও নড়বো না, কোথাও যাবো না। তোমরা উনাকে মারলে কেন? আমাকেও মেরে ফেলো। ঘাতকদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। আমার মা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল ও জামালের স্ত্রী রোজী জামাল মা'র ঘরে ছিল। সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করে ঘাতকেরা। রাসেলকে রমা জড়িয়ে ধরে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট রাসেল কিছুই বুঝতে পারছে না। একজন সৈনিক রাসেল আর রমাকে ধরে নীচের তলায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে বাড়িতে আরও যারা ছিল তাদেরও নীচে নিয়ে দাঁড় করায়।

গৃহকর্মী আব্দুল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাকেও নিয়ে যায়। বাড়ির সামনে আম গাছতলায় সকলকে দাঁড় করিয়ে একে একে পরিচয় জিজ্ঞেস করে। আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের পঙ্গু ছিলেন। তিনি বার বার মিনতি করছিলেন: আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা; আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে মেরো না। ছোট ছোট বাচ্চারা আমার, ওদের কী হবে? কিন্তু খুনিরা কোন কথাই কানে নেয় না। তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে অফিস ঘরের বাথরুমে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

রমার হাত ধরে রাসেল "মা'র কাছে যাব, মা'র কাছে যাব" বলে কান্নাকাটি করছিল। রমা বারবার ওকে বোঝাচ্ছিল: তুমি কেঁদো না ভাই। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু অবুঝ শিশু মায়ের কাছে যাব বলে কেঁদেই চলছে। এ সময় একজন পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পেয়ে বলে: চলো, তোমাকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

ভাইয়ের লাশ, বাবার লাশ মাড়িয়ে রাসেলকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে মায়ের লাশের পাশেই গুলি করে হত্যা করে। দশ বছরের ছোট্ট শিশুটাকে ঘাতকের দল বাঁচতে দিল না।

যে বাড়ি থেকে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি রক্তে ভেসে গেল। সেই রক্তের ধারা ওই সিঁড়ি বেয়ে বাংলার মাটিতে মিশে গেছে– যে মাটির মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৪৬ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন সাফায়েত জামিল। সেনাপ্রধান তাঁকে ফোন করে পায়নি। সিজিএস খালেদ মোশাররফও কোন দায়িত্ব পালন করেনি। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেনি বরং সে পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। খুনি রশিদ ও ফারুক বিবিসি-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার কথা বলেছে। খুনি মোস্তাক জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। ঢাকার তৎকালীন এসপি মাহবুবকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।

মেজ ফুপুর বাসা

ঘাতকেরা ধানমন্ডির মেজ ফুপুর বাড়ি আক্রমণ করে রিসালদার মোসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে। তাদের একটি দল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে গালি দিতে থাকে। বুটের আওয়াজ আর চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা এবং *বাংলার বাণী*র সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বন্দুক তাক করে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে ঘাতকের দল। এ সময় তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ঘাতকদের বুলেট থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ঘাতকের দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। বুলেটের আঘাতে দুজনের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিথর দেহ দুটি। ছোট দুই ছেলে, তিন বছরের তাপস আর বছর পাঁচেকের পরশ, মা-বাবার লাশের পাশে এসে চিৎকার করতে থাকে আর বলতে থাকে: মা ওঠো, বাবা ওঠো। ঐ শিশুদের কান্না মা-বাবা কি শুনতে পেয়েছিল? ততক্ষণে তাঁরা তো না-ফেরার দেশে চলে গেছে। শিশুদের চোখের পানি মা-বাবার রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সেজ ফুপুর বাড়ি

গুলি করতে করতে মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর এ এম রাশেদ চৌধুরী মিন্টু রোডে সেজ ফুফার সরকারি বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়। পরিবারের সকল সদস্যকে তাঁদের ঘর থেকে বের করে নিচতলায় বসার ঘরে নিয়ে আসে। এর পর তাদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন আবার ফুপু আমিনা সেরনিয়াবাত, আমার ফুফা কৃষিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বিউটি, বেবি, রিনা, ছেলে খোকন, আরিফ, বড় ছেলে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর স্ত্রী শাহানা, নাতি সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ, ভাগ্নে রেন্টু। আট বছরের নাতনি কান্তা গুলিবিদ্ধ লাশের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। দেড় বছরের নাতি সাদেক গুলিবিদ্ধ মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে। আট বছরের কান্তা নিজের ফুপু বেবির লাশের নীচে চাপা পড়েছিল। সেখান থেকে কোন মতে বের হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সারি সারি গুলিবিদ্ধ আপনজন পড়ে আছে। কারও নিথর দেহ, কেউ বা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ঘরের কোণায় রাখা অ্যাকুরিয়াম গুলি লেগে ভেঙে যায়। অ্যাকুরিয়ামের পানির সঙ্গে মাছগুলি মাটিতে পড়ে যায়। রক্ত ভেজা পানিতে মাছগুলিও ছটফট করে লাফাতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে আপনজন মা, বাবা, দাদা-দাদি, চাচা, ফুপুসহ সকলকে নিয়ে এই শিশুরা ছিল, আর এখন গুলিবিদ্ধ রক্তে ভেজা আপনজন। লাশের নীচ থেকে নিজেকে বের করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ৮ বছরের শিশুটি অবাক বিস্ময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়ে লেকের ওপার থেকে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবন লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সেই গুলি মোহাম্মদপুরে এক বাড়িতে পড়ে। সেখানে ১১ জন মানুষ নিহত হয় আরও অনেকেই আহত হয়। মেজর ডালিম রেডিও স্টেশন দখলের দায়িত্বে ছিল। সেখান থেকেই সে ঘোষণা দেয়: শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকেরা শুধু হত্যা করে তাই নয়, তারা আমাদের বাসা লুটপাট করে। আমার বাবার শোবার ঘরে এবং ড্রেসিং রুমের সকল আলমারি, লকার সবকিছু ভেঙে সেখান থেকে যা কিছু মূল্যবান ছিল– গহনা, ঘড়ি, টাকা-পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। বাসায় ব্যবহার করা গাড়িটাও মেজর হুদা ও নূর নিয়ে যায়।

আলমারির সব কাপড়চোপড় বিছানার ওপর পড়েছিল। সেগুলোর অনেকগুলোতে ছিল রক্তের দাগ। এই হত্যাকাণ্ডের পর লুটপাটের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ওদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা এই সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের কত বড় সর্বনাশ করেছিল তা কি ওরা বুঝতে পেরেছিল?

যে বুকে বাংলার মানুষের জন্য প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল, সেই বুকটাই ঝাঁঝরা করে দিল তাঁরই প্রিয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু দুর্বৃত্ত। আমার আব্বা কোনদিন বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে, বাংলাদেশের কোন মানুষ তাঁকে মারতে পারে, বা কোন ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর অনেক নেতাই তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওরা তো আমার ছেলে, আমাকে কেন মারবে? এত বড় বিশ্বাস ভঙ্গ করে ওরা বাঙালির ললাটে কলঙ্ক লেপন করল।

কী বিচিত্র এ দেশ! একদিন যে মানুষটির একটি ডাকে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় এনেছিল, বীরের জাতি হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে মর্যাদা পেয়েছিল, আজ এই হত্যাকাণ্ডের

মধ্যে দিয়ে সেই জাতি সমগ্র বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতক জাতি হিসেবে পরিচিতি পায়। খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের এদেশের অগণিত জনগণ ঘৃণা করে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে।

আমার অন্তঃসত্ত্বা চাচি ছয় জন সন্তান নিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। খুলনায় ভাড়ার বাসায় বসবাস করতেন। সে বাসা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। ঘরবাড়ি হারা সদ্য বিধবা কোথায় ঠাঁই পাবেন?

সোবহানবাগ

আব্বার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় ঘাতকেরা। তিনি এগুতে চাইলে ঘাতকেরা তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে।

আমাদের বাড়ির নীচে পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্য এসআই সিদ্দিকুর রহমানকেও তারা গুলি করে হত্যা করে।

বেলজিয়াম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ...। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো টেলিফোনের আওয়াজ এত কর্কশ? আমি ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। দেখি নীচে অ্যাম্বাসেডর সানাউল হক সাহেব ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ওয়াজেদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। অপর পারে জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব কথা বলছেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ক্যু হয়েছে। আমার মুখ থেকে বের হল: "তাহলে তো আমাদের আর কেউ বেঁচে নাই"। রেহানা পাশে ছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু তখনও জানি না কী ঘটনা ঘটেছে।

মাত্র ১৫ দিন আগে জার্মানি এসেছি। বেলজিয়ামে বেড়াতে এসেছি। নেদারল্যান্ডেও গিয়েছিলাম। আব্বা বলেছিলেন, নেদারল্যান্ড কীভাবে সাগর থেকে ভূমি উত্তোলন করে- পারলে একবার দেখে এসো। একদিন আগেই আব্বা-মার সঙ্গে কথা হয়েছে। কেন জানি মা খুব কাঁদছিলেন। বললেন, "তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে, তুই আসলে আমি বলবো।" আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল তখনই দেশে ছুটে চলে যাই।

আব্বা বললেন: রোমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে তিনি যাবেন। আর ফেরার পথে আমাদের নিয়ে আসবেন।

কিন্তু আমাদের আর দেশে ফেরা হলো না। একদিন পরই সব শেষ। বেলজিয়ামের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হক, যিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছায় অ্যাম্বাসেডর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, রাতারাতি তার চেহারাটাই পাল্টে গেল। তিনি জার্মানিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ সাহেবকে বলেন, যে বিপদ আমার কাঁধে পাঠিয়েছেন তাঁদের ফেরত নেন।

যিনি আগের রাতে আমাদের জন্য 'ক্যান্ডেল লাইট ডিনার'-এর আয়োজন করেছিলেন; কত খাতির, আদর-যত্ন, আর এখন আমরা তার কাছে আপদ হয়ে গেলাম। আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িটাও দিলেন না। বেলজিয়াম অ্যাম্বাসিতে কর্মরত আমার স্কুলের বান্ধবী নমি'র স্বামী জাহাঙ্গীর সাদাতের গাড়িতে করে আমাদের বেলজিয়াম বর্ডারে যেতে বললেন। জাহাঙ্গীর সাদাত আমাদের জার্মানির বর্ডারে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নোম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে আমরা জার্মানির মাটিতে পৌঁছলাম। জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন। আর তাঁর স্ত্রী আমার বাচ্চাদের জন্য শুকনো খাবার-দাবারও গাড়িতে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে কয়েকদিন আশ্রয় পেলাম। তাঁদের আদর যত্ন দুঃসময়ে আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান। আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না হুমায়ুন রশিদ ও তাঁর স্ত্রীর অবদান। জার্মান অ্যাম্বাসির সকল অফিসার ও কর্মচারী আমাদের অত্যন্ত যত্ন করেছিলেন। অ্যাম্বাসির গাড়িতে আমাদের কার্লস রুয়ে পৌঁছে দিলেন। জার্মান সরকার, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ আরও অনেকে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চাইলেন। জার্মানিতে নিযুক্ত ভারতের অ্যাম্বাসেডর জনাব হুমায়ুন রশিদ ও ডক্টর ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের ভারতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। আমরা জার্মানি থেকে ভারতে পৌঁছালাম।

উপসংহার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত বেদনার আঘাত বুকে ধারণ করে আমার পথচলা। বাবা-মা-ভাইদের হারিয়ে ৬ বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি, যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, তা ব্যর্থ হতে পারে না। লাখো শহিদের রক্ত আর আমার বাবা-মা-ভাইদের রক্ত ব্যর্থ হতে আমি দেব না।

আমার চলার পথ খুব সহজ ছিল না, বারবার আমার উপর আঘাত এসেছে। মিথ্যা অপপ্রচার, গুলি, বোমা ও গ্রেনেড হামলার শিকার হতে হয়েছে আমাকে। খুনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় বলেছিল, "শত বছরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারবে না।" "শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা বিরোধী দলের নেতাও কখনও হতে পারবে না।" এর পরেই তো সেই ভয়াবহ ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানবঢাল রচনা করে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। উপরে আল্লাহ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আর বাংলাদেশের জনগণই আমার শক্তি। আমার চলার কণ্টকাকীর্ণ পথে এরাই আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। তাই আজকের বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি দিতে পেরেছি। তারা এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

বাবা! তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার আশীর্বাদের হাত আমার মাথার উপর আছে– আমি তা অনুভব করতে পারি। তোমার স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। তোমার দেশের মানুষ তোমার গভীর ভালোবাসা পেয়েছে আর এই ভালোবাসার শক্তিই হচ্ছে এগিয়ে যাবার প্রেরণা।

শেখ হাসিনা: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা

প্রবন্ধ

শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

মোনায়েম সরকার

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যেসব মহান পুরুষ জন্ম নিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান শেখ মুজিব। তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা। তাঁর দূরদর্শী ও ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বে একটি পরাধীন জাতি পায় স্বাধীনতার স্বাদ। বহু বছরের শোষণ-দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি গড়ে তোলেন সমৃদ্ধিশালী, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। একটি অবহেলিত ভূখণ্ডের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করার মতো নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই বিরল নেতা। শেখ মুজিব প্রজাপ্রেমী ও দূরদর্শী আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। যে মানুষটি কখনোই বাঙালিকে অবিশ্বাস করেননি, শত্রু ভাবেননি, সেই শুদ্ধচিত্তের মানুষটিকেই কতিপয় স্বার্থপর-ঘাতক বিপথগামী সেনাসদস্য সপরিবার হত্যা করল– যা শুধু বাঙালির ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি কলঙ্কজনক ঘটনা বলে বিবেচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যাকাণ্ডই নয়, একটি স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক জাতিকে পরাধীন ও সাম্প্রদায়িক করার পাশবিক চক্রান্তও বটে। আমরা যদি মুজিব হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রগুলো বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, একটি স্বাধীন জাতিকে মূলত তারাই ধ্বংস করতে চায় যারা সাম্রাজ্যবাদের পূজারি বা সাম্রাজ্যবাদের মদদদাতা। সুতরাং যারা সাম্রাজ্যবাদী এবং যারা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক তারাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র বাংলাদেশ থমকে গিয়েছিল। বজ্রাহত মানুষের মতো অসাড় হয়ে গিয়েছিল বাংলার শোকাহত মানুষ। ঘনিষ্ঠ স্বজন মারা গেলে মানুষ যেমন বাক্‌রুদ্ধ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, শেখ মুজিব হত্যার ঘটনায়ও পুরো বাঙালি জাতি শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। মানুষ এখন সেই অবশ মুহূর্তগুলোর কথা ভুলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করছেন। শেখ মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী এক অনন্য বাঙালি।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। এদিন কেবল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি, মুজিবপত্নী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র, পুত্রবধূসহ গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব নিহত হননি। আবার কেবল ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি বা ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, এর সঙ্গে জড়িত ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা। এই চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে। তা আমরা প্রতিনিয়তই বুঝতে পারছি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার আগের দিন ঢাকা শহরে বাস-ট্রাকে আগুন, ব্যাপক ভাঙচুর ও নাশকতামূলক তৎপরতায় মানুষের মনে সে কথাই ধ্বনিত হয়েছে। যে আবরণেই তারা তৎপরতা চালাক না কেন, জনগণ ঠিকই তাদের নাশকতামূলক তৎপরতা ধরে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে নির্মম এবং নৃশংস। দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা সদম্ভে ঘোষণা করেছে এ খুনের দায়দায়িত্বের কথা। তবুও এই ঐতিহাসিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল দীর্ঘ একুশ বছর।

১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর 'দি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' জারি হয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই কালো অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নিহত জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানসহ সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার বাধা অপসারিত হয়। পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক দুঃশাসনকালে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। যে মহান ব্যক্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছেন, বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় আদায় করে দিয়েছেন, বাঙালি জাতির একটি নিজস্ব আবাসভূমি এনে দিয়েছেন, সেই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের বিচার এত দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল, এ কথা কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ ভাবতেই পারে না।

বঙ্গবন্ধুর বড়ো কৃতিত্ব তিনি বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে এর প্রক্রিয়াকরণ চলেছে বহুদিন ধরে। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, আন্দোলন ও সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ যা এক সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল, সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই শেখ মুজিব 'পূর্ববঙ্গ'কে 'বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করেন। এ দেশের রাজনীতির মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক ধারাটিকে ভেঙে দেন তিনি। 'মুসলিম লীগ' থেকে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এবং 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে নিয়ে গঠন করেন 'আওয়ামী লীগ'। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব। ১৯৭০-এর দশকে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এমনভাবে সমার্থক হয়ে উঠেছিল যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং এ সময় মানুষের মাঝে বাঙালি চেতনাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব স্ফুরণ ঘটেছিল।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত আহ্বান। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। একাত্তরের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে বাংলাদেশ গঠনের পথ সুগম করার অপরাধে পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তারা তা কার্যকর করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানের যেসব দেশি-বিদেশি দোসর মেনে নিতে পারেনি তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর দোসর এবং জামায়াতের আলবদর বাহিনীর সমর্থকরা নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। নানা বাধা, ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থিতিশীলতার দিকে নেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য ছিল। সোনা-রুপা, টাকাপয়সা, অবকাঠামো কিছুই সেদিন ছিল না। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শ্মশান বাংলাকে স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করেন। ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছিলেন, সদিচ্ছা থাকলে শূন্য হাতে যুদ্ধ করেও সফল হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু যখন সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করতে। তস্করের মতো রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হয় কতিপয় বাঙালি ঘাতক। এসব ঘাতকেরা বিদেশি প্রভুদের ইঙ্গিতে এবং এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক নরপশুদের সহযোগিতায় ইতিহাসের কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারা ফিরিয়ে আনা হয়। হত্যাকারীরা বাংলাদেশের সর্বত্র ভয়ভীতি-সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠিত করে এবং দেশপ্রেমিক নেতাকর্মীদের ওপর জেল-জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হতচকিত জাতি এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে অবস্থান নিতে পারেনি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল নেতৃত্বের কারণে। দলের লড়াকু নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় দলীয় কাজকর্ম যেন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাই তাঁরা কর্মীদের নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে পারেননি। যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন সে সব প্রথম সারির নেতারাও কেন যেন নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড যেমন ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল আমাদের, তেমনি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডে আমরা পিছিয়ে যাই এবং দেশ আবার উল্টোমুখে ফিরে যায় পাকিস্তানি ধারায়। এতে পাকিস্তানিরা এবং দেশীয় ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা উল্লসিত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মকে টেনে আনা হয় রাজনীতিতে। সংস্কৃতি ও জীবনমান উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ। জেল-জুলুম, অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক নেতাকর্মী। যে বঙ্গবন্ধু নামের বীজমন্ত্রে বাংলাদেশ উদ্বেলিত ছিল, সেই নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যিশুখ্রিষ্টের হত্যাকাণ্ডের একটি অদ্ভুত মিল আছে। মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ সহচরদের ষড়যন্ত্রে ক্রুশবিদ্ধ হন যিশু। যিশুর মৃত্যুর পরে দীর্ঘদিন তাঁর নাম উচ্চারণ করা যায়নি, অথচ আজ সমগ্র বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সর্বাধিক। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের গোপনে হাত মিলায় তাঁর কতিপয় সহযোদ্ধা। তারাও দীর্ঘকাল বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চার বছর পরে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে শোক পালন করা হয়। ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করে আমরা শোকসভা করি। প্রকাশ করি– *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, *রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি* ও *বাঙালির কণ্ঠ*-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ। যিশুর মানব মুক্তির বাণী ও আদর্শকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছে বিশ্ববাসী, তেমনি বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত রাজনৈতিক মতবাদ 'শোষিতের গণতন্ত্র'ও একদিন মানবিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীজুড়ে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেমে আসে মহাবিপর্যয়। স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ অর্থনীতির যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, তা পরিণত হয় মরীচিকায়। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বলে পরিচিত বাংলাদেশ পরিণত হয় স্থায়ী খাদ্য ঘাটতির দেশে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে টানা একুশ বছর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। অসংখ্য সংগ্রামী জনতার রক্ত ঝরে বাংলার মাটিতে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীনতার ধারায় বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের হত্যা এবং আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীদের ওপর নির্মম দমননীতির মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা হয়। শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্রুত পুনর্গঠিত হয়। জনগণ ফিরে পায় ভোটাধিকার। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন এই অধিকার প্রয়োগ করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আওয়ামী লীগকে। পাকিস্তানি ধারার পরিবর্তে দেশ পুনরায় এগিয়ে চলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারায়। অর্থনীতি ফিরে পায় গতিশীলতা। তলাবিহীন ঝুড়ি আর ভিখারির দেশের অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। শত্রু-মিত্র চিনতে হবে তাঁকে। কেউ যেন বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে সুবিধা আদায় না করতে পারে এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি সম্মানার্থে কর্মীদের উচিত তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো নিপুণভাবে সম্পন্ন করা। দেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের কাঁধে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এখনও অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহজ ব্যাপার নয়, অনেক কঠিন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করে যেতে হবে। এ দেশকে একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্ববন্ধু হয়ে উঠেছেন। তাঁর নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন তিনি। শান্তিকামী বঙ্গবন্ধু শান্তির পক্ষে লড়াই করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেস্কো ঘোষিত শান্তি পদক বাঙালি জাতিকে নতুন গৌরব দান করেছে। সারাবিশ্বেই মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। মানুষের অন্তরে বঙ্গবন্ধু আজ অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৫ই আগস্ট বাঙালির জন্য এখন শুধু আর শোকের মুহূর্ত নয়, শোক এখন পরিণত হয়েছে শক্তির অনির্বাণ উৎসবিন্দুতে। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিক, লেখক ও মহাপরিচালক, বিএফডিআর, bfdrms@gmail.com

প্রবন্ধ

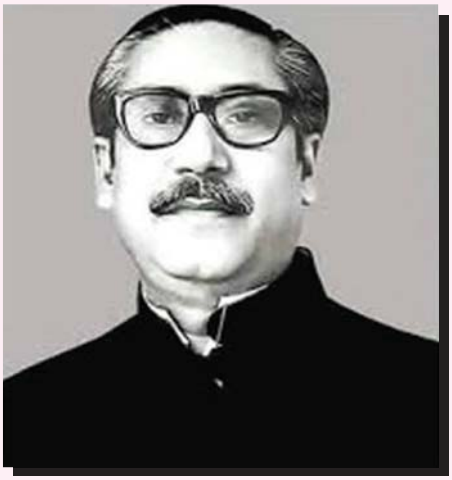

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড
ষড়যন্ত্রকারী কারা?

হারুন রশীদ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের হত্যার পর বাংলাদেশে শুরু হয় বিচারহীনতার সংস্কৃতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি, দেশের রাষ্ট্রপতি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আত্মস্বীকৃত হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় তো আনাই হয়নি, রাষ্ট্র আইন করে নৃশংস ঐ হত্যাকাণ্ডকে দায়মুক্তি প্রদান করে। খুনিরা পায় রাষ্ট্রের পুরস্কার। যে দেশে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতি হত্যার বিচার হয় না, পুরস্কৃত হয় হত্যাকারীরা, সে দেশে আর কোনো হত্যা ও নৃশংস অপরাধের যথাযথ বিচারের আশা করা অবান্তর। বাংলাদেশে এমন অবস্থা বজায় ছিল ২১ বছর। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের 'দায়মুক্তি' আইন বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পট পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘদিন বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত আইনে খুনিদের বিচার হয়েছে এবং অধিকাংশ খুনির দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের সাজা হয়েছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়করা আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে। একথা মনে করার কারণ নেই যে, কোনো রকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া এ রকম একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্যে অন্যতম খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে আগস্ট ট্র্যাজেডি মিলে যায় উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের সাথে।

স্কটিশ সেনাপতি ম্যাকবেথ যুদ্ধ জয় করে দেশে ফেরার সময় তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তিন ডাকিনী। ডাকিনীরা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে বলে যে, ম্যাকবেথ হবেন স্কটল্যান্ডের রাজা। ম্যাকবেথ চিঠির মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী লেডি ম্যাকবেথকে জানান। চিঠি পেয়ে লেডি ম্যাকবেথের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। তার প্ররোচনায় নিজ প্রাসাদে রাজা ডানকানকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন ম্যাকবেথ। রাজা ডানকানের হত্যার দায় এড়াতে এবং নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে ম্যাকবেথ একে একে হত্যা করেন রাজা ডানকানের দুই দেহরক্ষী, সেনাপতি ব্যাঙ্কো এবং ম্যাকবেথের বিরোধিতাকারী ম্যাকডাফের স্ত্রী ও সন্তানদের। ম্যাকবেথ ভুলে যান যে, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। নাটকের শেষে লেডি ম্যাকবেথ আত্মহত্যা করে। আর পাগল হয়ে যান ম্যাকবেথ। নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিতে ম্যাকডাফ ম্যাকবেথের শিরচ্ছেদ করেন। তবে মঞ্চে এই দৃশ্যটি অভিনীত হয়নি।

আমরা যদি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে রাজা ডানকানের হত্যাকাণ্ডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো বঙ্গবন্ধুকেও তাঁর অনুগত সেনারা হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিলেন খোন্দকার মোশতাক। তিনি লেডি ম্যাকবেথের মতোই হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু প্ররোচনায় যুক্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকেই। লেডি ম্যাকবেথ তার কৃত্রিম আতিথেয়তায় রাজাকে মোহিত করে। হত্যাকাণ্ডের কিছু সময় আগেও তার আতিথেয়তা অব্যাহত ছিল। খোন্দকার মোশতাককেও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পূর্বে বিশ্বস্ততার নানারকম ভান করতে দেখা গেছে। ম্যাকবেথ যেমন বিশ্বস্ত ছিলেন রাজা ডানকানের, খোন্দকার মোশতাক আহমেদও বঙ্গবন্ধুর কাছে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ম্যাকবেথ তার ক্ষমতাকে সংহত করতে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন। একইভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খোন্দকার মোশতাকের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখা যায়।

যবনিকায় ম্যাকবেথের শাস্তি হয়েছে। কিন্তু রাজা ডানকান ফিরে আসেননি। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হয়েছে। কিন্তু জীবন ও জগতের নিয়মে ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু তো আর ফিরে আসেননি। তবে তিনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন ভিন্নভাবে– তাঁর আদর্শ, দর্শন, চেতনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং এসব বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা নিয়ে।

এখন জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ। আমাদের চেতনায় জাগ্রত বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র যাতে সফল না হয় তার জন্য সচেতন থাকতে হবে আমাদের। আর কোনো ম্যাকবেথ বা মোশতাক যাতে দৃশ্যপটে আবির্ভূত না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে খুব জরুরি কাজটি হলো আগস্ট ষড়যন্ত্রের হোতাদের চিহ্নিত করে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা। এ কাজটি করতে পারলে তা হবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও চেতনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করতে হবে অবিলম্বে।

'তোমারে বধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে'– এই বহুল পরিচিত প্রবচনটি থেকে আমরা সব সময় শিক্ষা নেই না। অনেক সময় আমরা চেনা শত্রুকে ক্ষমা করে দেই। আবার অহেতুক অবিশ্বাস এবং কল্পিত শত্রুতা তৈরি করে প্রকৃত বন্ধু এবং শুভার্থীদের দূরে সরিয়ে রাখি। আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ রকম ভুল আমরা প্রায়শ করে থাকি। কিছুদিন আগে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় লেখা তাঁর কলামে মুক্তিযুদ্ধকালে কাদেরিয়া বাহিনীতে তাঁর অন্যতম এক বেসামরিক সহযোগী, যিনি ১৯৭৫ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন তার সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্নগুলো হলো: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘটনার সময় এবং ঘটনার পরে ওই কর্মকর্তা কেন কোনো ভূমিকা পালন করেননি? অথচ

সে সময় রক্ষীবাহিনী প্রধানের বিদেশে অবস্থানের সুবাদে তিনি ছিলেন বাহিনীর প্রধান ব্যক্তি। এরপর উক্ত কর্মকর্তা পররাষ্ট্র ক্যাডারে আত্মীকৃত হন এবং পরবর্তী সব সরকারের সময় দেশে এবং বিদেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫-এর পর রক্ষীবাহিনীর অনেক কর্মকর্তা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাদের বেশির ভাগই বিভিন্নভাবে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হয়ে কর্মজীবন সমাপ্ত করেছেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পর্যবেক্ষণ, কোনো সরকারের আমলেই পররাষ্ট্র ক্যাডারে আত্মীকৃত কাদেরিয়া বাহিনীর তাঁর ঐ সহযোগীর পেশাগত কোনো সমস্যা হয়নি।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বিভীষিকার দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ঘটনা ও ঘটনা-পরবর্তীকালে দায়িত্ব পালনে অবহেলার উদাহরণ হিসেবে তাঁর ঐ সহযোগীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, এ রকম ও এর চেয়ে অনেক বেশি অবহেলা ও দায়িত্বহীনতাকে আমরা এড়িয়ে গেছি।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার ঘটনার পর অনেকের মনেই কয়েকটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। খুনিরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সাথে সাথে আক্রমণ করেছিল তাঁর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ও ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও স্বজনদের হামলাকারীদের টার্গেট ও অ্যাকশন ছিল সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ, আগে থেকে পরিকল্পনা করেই ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়েছিল। এ রকম পরিকল্পনা শুধু ঘটনাস্থলে উপস্থিত চিহ্নিত খুনিরা করেছে, সেটা মানা যায় না। তাহলে ১৫ই আগস্টের ঘটনাবলির নেপথ্য পরিকল্পনাকারী কারা?

বলা হয়, নাইটমার্চের নামে হত্যাকারীরা ট্যাংক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেনানিবাসের বাইরে এসে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দখল নিয়েছিল। প্রশ্ন হলো, এক্সারসাইজ এরিয়া হিসেবে কোন যুক্তিতে ঢাকা শহরকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল? আর গোলাবারুদসহ ভারী অস্ত্র ও ট্যাংক নিয়ে ঢাকা শহরে নাইটমার্চের অনুমতি দিয়েছিল কোন কর্তৃপক্ষ? নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিতরা তাদের হালকা অস্ত্র দিয়ে ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রধারী হত্যাকারীদের রুখতে পারেনি। অভিজ্ঞ সূত্র থেকে জানা যায়, নিরাপত্তা বাহিনীতে কেবলমাত্র ফায়ারিং এক্সারসাইজের সময়ই অস্ত্রের সাথে গুলি বা অ্যামুনেশন দেওয়া হয়। সাধারণ এক্সারসাইজ বা নাইটমার্চে অ্যামুনেশন দেওয়া হয় না। তার মানে, ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতের নাইটমার্চে ব্যবহৃত ট্যাংক ও হেভি আর্মসে কোনো গুলি বা অ্যামুনেশন ছিল না। নিরাপত্তা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের এ বিষয়টি অজানা থাকার কথা না। তাহলে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তিরা কী কারণে ট্যাংক, কামান, হেভি মেশিনগানের ভয়ে (!) কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেন না? নাকি তারা ইচ্ছে করেই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন?

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তাঁকে, তাঁর নিকটাত্মীয় এবং রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠদের ভালোভাবে চেনে এবং তাঁদের সম্পর্কে জানে এমন লোকেরাই। তারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার বিনাশ করার জন্য একইসঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং নিকটাত্মীয়দের টার্গেট করেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা। তাদের পরিকল্পনা এতটাই সুপরিকল্পিত ছিল যে, তারা ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে নাইটমার্চের এক্সারসাইজ নিশ্চিত করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের ছেলে আব্দুল্লাহিল আযমী ৫ম বিএমএ লং কোর্সের ক্যাডেট হিসেবে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে যোগদান করেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনালের র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী গোলাম আজমের ছেলের কিন্তু সেনাবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার কথা না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আজম ১৯৭৬ সালের ১১ই জুলাই পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ভিজিট ভিসায় বাংলাদেশে আসেন। ১৯৮০ সালে গোলাম আজম বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবেই। একজন বিদেশি নাগরিকের সন্তান কীভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ছাড়পত্র পায়? ১৯৮০ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেটা হয়ত সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরপরও কখনও কেন আব্দুল্লাহিল আযমীর সেনাবাহিনীতে যোগদানের ছাড়পত্র প্রদানের পশ্চাৎঘটনা এবং ছাড়পত্র প্রদান সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করা হয়নি?

একটা অন্যায়, অপরাধ কিংবা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ঘটনার বিষয়ে তদন্ত হয়। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, ঘটনার দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয় তদন্ত প্রতিবেদনে। দেশে দেশে অনেক সময় ঘৃণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অন্যায় বা অপরাধ সংগঠনকারীদের মৃত্যুর পরও প্রতীকী বিচারের আয়োজন করতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য, ঘটে যাওয়া অন্যায় এবং অপরাধের স্বরূপ উন্মোচন ও জনসম্মুখে তা প্রকাশ করা, যাতে ভবিষ্যতে এ রূপ ঘটনা বা অন্যায় আর না ঘটে। অথচ ১৫ই আগস্টের নৃশংসতম ঘটনার পেছনের ঘটনা তদন্ত করে কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণের কোনো নজির আমরা দেখতে পাই না।

ম্যাকবেথ নাটকের কাহিনিতে ক্ষমতা লাভের যে নিষ্ঠুর ও জটিল দ্বন্দ্ব দেখা যায়, সমসাময়িক কালের পৃথিবীতে সে দ্বন্দ্ব আরও জটিল ও নৃশংস রূপ গ্রহণ করেছে। ছয়শো বছর আগে শেক্সপিয়র ক্ষমতা লাভের জন্য মানুষের নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা ও অমানবিকতাকে কল্পনায় যতটুকু দেখেছিলেন বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে, আমরা সেই কল্পনার নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছি। মানবিকতা বিকাশের সূচকে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সতেরোশো শতাব্দী থেকে পিছিয়ে পড়েছি। এর উদাহরণ জানতে আমাদের দূরে যাওয়ার বা দূরের ঘটনা দেখার দরকার নেই। জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর থেকে এ যাবৎ হত্যার উদ্দেশ্যে ১৯ বার তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তাঁর ওপর গ্রেনেড হামলার ঘটনা আমরা সবাই জানি। আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। শেখ হাসিনাকে হত্যা করা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত করা এবং বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়া।

আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে, উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, শুভচিন্তা ও মানবিকতার চর্চাকে নিষ্কণ্টক রাখতে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীদের খুঁজে বের করতে হবে। উদ্‌ঘাটন করতে হবে জাতীয় চার নেতা হত্যার ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সামনের কুশীলব মোশতাক। কিন্তু তার পেছনে কে বা কারা ছিল? এ প্রশ্ন বার বার মনে জাগে। এদের খুঁজে বের করতে হবে। আর খোঁজার কাজটা একইসঙ্গে শুরু করতে হবে ঘরে ও বাইরে। কেননা, কাছের মানুষের পরিচয়ে ঘরের ভেতরে থাকা ষড়যন্ত্রকারী ও শত্রুরা যে কত ভয়ংকর হয়– তা অনুধাবন করার জন্য আমাদের বাইরের দৃষ্টান্ত দেখার প্রয়োজন নেই।

হারুন রশীদ: নাট্যকার, লেখক ও অভিনেতা, haroon.r.84.adm@gmail.com

নিবন্ধ

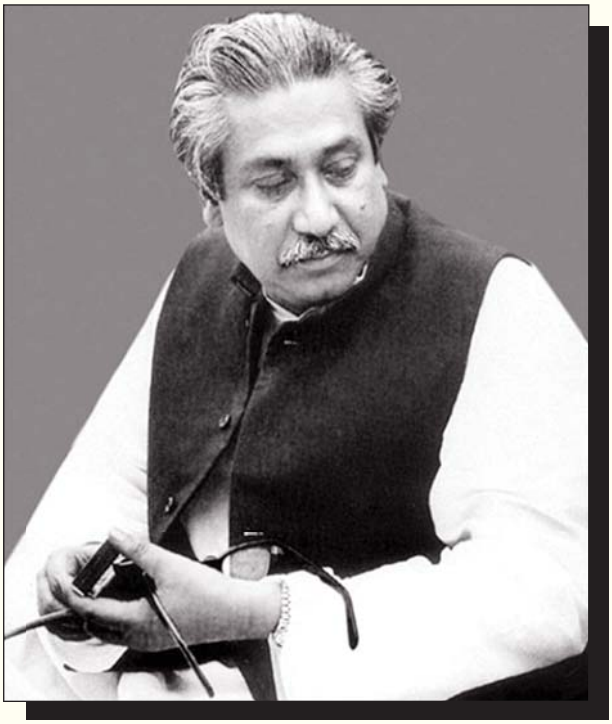

জাতির পিতা ও চ্যান্সেলর হত্যার বিচার

জাফর ওয়াজেদ

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট রাতে নেতাকে হত্যার তিন বছর দশ মাসের মাথায় ঘাতকদের পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতাধরের সামনে দাঁড়িয়ে চ্যান্সেলর হত্যার বিচার চেয়েছিলেন চার সাহসী ছাত্রনেতা। বলেছিলেন, তারা জাতির পিতা ও চ্যান্সেলর হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে পারে না। ছাত্রসমাজ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তাই তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য। সুতরাং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দ্রুত করতে হবে। কালো চশমা চোখের ঠান্ডা মাথার খুনিটির বাকি অবয়বে ক্রোধ জেগেছিল বুঝি। ১৯৭৯ সালের ৯ই আগস্ট বঙ্গভবনে এই দৃশ্য রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জানে বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। ঘাতক হরণ করতে পারেনি তাঁর আত্মমর্যাদা। হরণ করতে পারেনি তাঁর বাঙালিসত্তার পূর্ণতা। সৈন্য বর্মে বেষ্টিত কোনো দুর্গ যদি হতো তাঁর বাসস্থান, তবে রক্ষা পেতেন হয়ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু জীবিত থাকতেন না বঙ্গবন্ধু। যাঁর সারা জীবনের আপোশহীন অহংকারী কর্মে এই বাণী বার বার উচ্চারিত হয়েছে, 'আমি তোমাদেরই লোক'। তাই দেখি গুলিটা বঙ্গবন্ধুর পিঠে নয়, বুকে লেগেছিল। সাহসী মানব নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন ঘাতকদের সামনে। লুকানো বা পালানোর কোনো চেষ্টাই করেননি। যেমন করেননি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে।

কোনো বাঙালি ঘাতক হবে, এমনকি তাঁকে হত্যায় সচেষ্ট হবে– এমনটা ঘুণাক্ষরেও বঙ্গবন্ধু ভাবেননি। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও তাঁর দল ছিল অনেক পশ্চাতে। দলনেতারা সমানতালে বা কাছাকাছি যেতে পারেননি। পশ্চাতে পড়ে থাকা দলটি তাই প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। পঁচাত্তরের পর সামরিক জান্তার শাসনামলে দলটি থেকে আরও গোটা কয়েক দল জন্ম দেওয়া হয়। এরা আওয়ামী লীগ বিরোধী অবস্থান নেয়– যারা জেল, জুলুম, হুলিয়া উপেক্ষা করে দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালান। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কাউকে বিশ্বাস না করার সংখ্যারও কমতি ছিল না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দলের নেতাকর্মীরা নিজেদের আড়াল রাখতেই বেশি তৎপর ছিলেন। সারা দেশেই ছিল এমন পরিস্থিতি। শ্বাসরুদ্ধকর, স্থবির, হতাশায় নিমজ্জিত অবস্থা। তথাপি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি দল।

বঙ্গবন্ধু অবশ্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিলেন স্বাধীনতা-পূর্বকাল থেকে নেওয়া প্রস্তুতির পর্ব পেরিয়ে। একটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন। এমনিতে বাঙালি জাতি কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ ছিল না। সেই জাতিকে একটি দণ্ডে এনে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছিলেন। কতিপয় অপগণ্ডের বিরোধিতা করেছিল। সেই দলটি বঙ্গবন্ধুহীন অবস্থায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক যেন। অনেক নেতাকর্মী কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলেন। ছাত্রনেতাদের অনেকে ছিলেন কারাগারে, কেউ কেউ আত্মগোপনে। ছাত্রলীগ পুনর্গঠন করাও ছিল দুরূহ। তবুও বাঙালি তরুণরা সাহসে বুক বেঁধে আবারও সংগঠিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগও অংশ নিয়ে নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ফেস্টুন, ব্যানার, পোট্রেট ও বিভিন্ন স্লোগান লিখিত পোস্টার দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। ১৫ই আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনিরা দেশে সামরিক আইন জারি করে। তারা অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল খুলে ফেলে এবং সব সাজানো উপকরণ একত্রিত করে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে পুড়িয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে হামলা চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বোস প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাবন্দি করেছে। দীর্ঘ সময় জেল খাটার পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক জান্তার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই সেদিন ট্যাংকবাহিনী

ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিল এবং ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নিয়ে সামগ্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়। তদুপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে একটি-দুটি করে দেয়াল লিখনও চোখে পড়তে শুরু করে। ১৯৭৫-এর ৪ঠা নভেম্বর বটতলায় বড়ো একটা জমায়েত হয়। এই জমায়েত শেষে একটি মিছিল বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে যায়, পথে পথে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে।

সামরিক জান্তার ক্ষমতা প্রলম্বিত হতে থাকে। এরই মধ্যে ১৯৭৯-এর ৯ই জুন ডাকসু নির্বাচন হয়। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর জান্তা শাসক টের পায় যে, বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে শক্তিমত্তা অর্জন করেছে। তাই জিয়া মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচন বন্ধ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালের ১লা জুন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং অপর দুই কোলাবরেটর মন্ত্রী এসএ বারী ও এমরান আলী সরকার শিক্ষাসচিব কাজী ফজলুর রহমানকে ডেকে বলে দেন যে, ডাকসু নির্বাচন বন্ধ করতেই হবে। সচিব বলেন, কথাটা আমি উপাচার্যকে জানাতে পারি। কিন্তু তিনি যদি রাজি না হন, তবে? এসএ বারী বলেন, যেমন করেই হোক বন্ধ করতে হবে। অবশেষে উপাচার্যকে ফোন করা হয়। ফোনে ফজলুল হালিম চৌধুরী বলেন, এখন কিছু করতে গেলে রক্তারক্তি অনিবার্য।

১৯৭৯ সালের ৯ই জুন অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ১৯টি আসনের মধ্যে জাসদ সমর্থিত মান্না-আখতার পরিষদ পায় ১৫টি আসন এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাদের-রবিউল পরিষদ পায় ৪টি আসন। স্বাধীনতার পর তৃতীয় নির্বাচন। আর এতে ছাত্রলীগ প্রথমবারের মতো ডাকসুতে ঠাঁই পায়। তখন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া চ্যান্সেলর বনে যান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। ১৯৭৯ সালের আগস্টের গোড়ায় বঙ্গভবন থেকে আমন্ত্রণ আসে চ্যান্সেলরের সঙ্গে ডাকসুর নবনির্বাচিতদের ইফতারে অংশগ্রহণের। উপাচার্যের সঙ্গে ডাকসুর বৈঠকে মান্না-আখতার ইফতার পার্টিতে যেতে তখন রাজি হন। বাদ সাধে চারজন। তারা শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিত থাকার বিষয়ে আপত্তি জানায়। নতুবা তারা যোগ দেবে না বলে জানায়। পরিস্থিতির চাপে মান্না-আখতার পরিষদ শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্নটি মেনে নেয়। উপাচার্যের মাধ্যমে তা বঙ্গভবনকেও জানানো হলে পরদিন তা মেনে নেয় বঙ্গভবন। ছাত্রলীগ তখন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন। তাই দলের সভাপতি আবদুল মালেক উকিলের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর চারজন ইফতার পার্টিতে যোগ দিতে রাজি হয়। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ঢাকার বাইরে থাকায়, তার মতামত মেলেনি। ইফতারে যোগদান শেষে আওয়ামী নেতাদের ব্রিফিং করতে গেলে তিনি ক্ষুব্ধ হন।

বঙ্গভবনে যাওয়ার আগে ডাকসুর বৈঠকে আলোচনায় চারজন প্রস্তাব করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্মিলিতভাবে ডাকসুর পক্ষ থেকে চাওয়া হবে। মান্নারা তাতে রাজি হয়নি। চারজন দাবিতে অনড় থেকে জানায়, এই দাবি উত্থাপনের জন্যই তারা ইফতার পার্টিতে যাচ্ছে। কিন্তু মান্না-আখতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন কর্নেল তাহের হত্যার বিচার দাবির প্রস্তাব চাপানোর চেষ্টা করে, কিন্তু চারজন রাজি হয়নি। ৯ই আগস্ট সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ইফতার পার্টিতে যোগ দেয় ডাকসুর নবনির্বাচিত সদস্যরা। বঙ্গভবনে ডাকসুর সভাপতি উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রেজিস্ট্রার সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসাইন ছিলেন। গণভবনে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান, শিক্ষাসচিব কাজী ফজলুর রহমান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবুল বাতেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. জে. মোস্তাফিজুর রহমানসহ উর্দিপরা কজন ছিলেন। ডাকসুর মান্না, আখতার, মনজুরুল ইসলাম, নুরুল আকতার, ওয়াহিদুজ্জামান পিন্টু, আলী রিয়াজ, গোলাম কুদ্দুসসহ জাসদের ১৫ জন এবং মুজিববাদী বলে পরিচিত দলের মনজুর কাদের কোরাইশী, কামাল শরীফ, এনায়েতউল্লাহ এবং নিবন্ধকার জাফর ওয়াজেদ।

সারিবদ্ধভাবে গোল হয়ে দাঁড়ানোদের সঙ্গে পরিচিত হন জেনারেল জিয়া। পরপর দাঁড়ানো জাসদের ১৫ জন কর্নেল তাহের হত্যার বিচার চায়। মান্না-তাহেরকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, রব-জলিল জেলে কেন প্রশ্ন তোলে, বাকশালীদের বিচার কেন হয় না। একজন বলেন, হলে থাকার সিট কম, ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। জিয়া মান্নাদের বলেন, তাহের আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে– সে ছিল সরল মানুষ। তাকে সামনে রেখে কিছু দুষ্কৃতকারী দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। অফিসার ও সেনাদের হত্যা করেছে। জাসদ রব-জলিলসহ কারাবন্দি তাদের দলীয় নেতাদের মুক্তি দাবি করে।

শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো ছাত্রলীগের চারজন। বুকে যাদের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির ব্যাজ। তারা পরস্পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি করে হাত মেলানোর সময়। চারজন পৃথকভাবে আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার আজ জাতীয় দাবি। এই হত্যার বিচার না হলে শিক্ষাঙ্গনসহ দেশে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে না। প্রশ্ন করি, জেল হত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না? বাংলাদেশ বেতার কেন রেডিও বাংলাদেশ হলো? ক্যাম্পাসে অস্ত্র নিয়ে এখনও লোকজন কী করে ঘোরাফেরা করে? এতে রাষ্ট্রপতি বিব্রত হন। তিনি একটু আসছি বলে চলে যান। কিছু সময় পর ফিরে এসে মান্নাকে ডেকে অদূরে চেয়ারে বসে একান্তে মিনিট পাঁচেক কথা বলেন। কিন্তু কী আলাপ করেছেন, তা প্রকাশ করেননি। ডাকসুর পুরো কমিটি সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাইলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতো।

শিক্ষাসচিব কাজী ফজলুর রহমান, তার *আমলার দিনলিপি* গ্রন্থে সেদিনের কথা উল্লেখ করেন যে, 'আজকের এই দিনটি রাষ্ট্রপতি বোধহয় কিছুতেই ভুলতে পারবেন না। তিনি বোধহয় এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে কোনোদিন পড়েননি। ছাত্ররা খোলাখুলিভাবে তার মুখের ওপর যেসব কথা বলল, তাতে আমার দেশের ছাত্রদের ওপর আস্থা বেড়ে গেছে।' সেদিন উপাচার্য সন্তুষ্ট হয়েছিলেন আমাদের দাবিতে। পরে তিনি এ কথা আমাদের বলেছিলেন।

জাফর ওয়াজেদ: কবি, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

নিবন্ধ

জাতীয় শোক দিবস

ফিরে দেখা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলাদেশ এবং বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি কলঙ্কময় দিন। এদিন স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় ঘাতকের হাতে বাঙালির জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া সপরিবার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন নির্মমভাবে শহিদ হন। এই ঘাতকচক্র ছিল খোন্দকার মোশতাকের লেলানো খুনি ফারুক-রশীদ গং। আর এদের পেছনে ছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী।

১৯৭৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আগস্টের কালপঞ্জির বয়স ৪৮ বছর হলো। তবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল মেঘে ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময়ে শেখ মুজিব ও আগস্টের প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে রাখা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংবিধান ও রাষ্ট্রের সকল অবকাঠামো। বাংলাদেশ নামক দেশটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত হয়।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুকন্যা স্বদেশে ফেরেন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে। মূলত শেখ হাসিনার স্বদেশে আসার কারণে বাংলার আকাশে কালোমেঘগুলো আড়ালে লুকোতে থাকে। সংগ্রাম ও ভোটের অধিকার আদায়ে তাঁর কেটে যায় একুশটি বছর।

কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট কী হয়েছিল? আমরা কি তখন তা জানতে পেরেছি? এইটুকু জেনেছি শেখ মুজিবুর রহমানের বংশকে নির্বংশ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে ১৫ই আগস্টের সেই হত্যাকাণ্ডের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা তখন জানতে পারি, ফারুক-রশীদ গং দেশি-বিদেশিদের গভীর ষড়যন্ত্রে ও মদদে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং তারা একাত্তরের বিজয়কে নস্যাৎ করে। একযোগে ও একই সময়ে বত্রিশ নম্বর সড়কে ৬৭৭ নম্বর বাড়ি (মুজিব ভবন) এবং ধানমন্ডির অন্য একটি বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ও মিন্টু রোডে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ করে সামনে যাঁকে পেয়েছে তাঁকেই হত্যা করেছিল ফারুক, রশীদ, ডালিম, হুদা ও নূররা।

এই সময় খুনিরা শাহবাগের বেতার ভবন দখলে নেয়। এক খুনি মহিউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গোলা ছোড়ার সময় অদূরে মোহাম্মদপুরে শেরশাহ সুরি রোডের ৪টি বস্তিঘরে শিশুসহ ১৩ জনকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটির আজও বিচার হয়নি।

বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

খালেদ মোশাররফ ক্যু করে জানতে পারেন মোশতাক এবং খুনিরা দেশ ছাড়ার সময় কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। অবশ্য খুনি মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করেই তাঁদের বন্দি করে রাখে কেন্দ্রীয় কারাগারে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই গ্রন্থিতে বাঁধা। আগস্টের অসমাপ্ত কাজই সম্পন্ন করেছিল খুনি মোশতাকের নির্দেশে।

পনেরোই আগস্ট গুলিতে প্রাণ হারান বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা, জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল, দশ বছরের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, শেখ কামালের পত্নী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামালের পত্নী পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সেরনিয়াবাতের তেরো বছরের কিশোরী কন্যা বেবী, সেরনিয়াবাতের চার বছরের শিশু দৌহিত্র বাবু, শেখ মণির স্ত্রী আরজু মণি, কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ, সেরনিয়াবাতের ভাইপো শহীদ সেরনিয়াবাত, আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই আবদুল নঈম খান রিন্টু, পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান, তিনজন অতিথি ও চারজন গৃহভৃত্য আর মোহাম্মদপুরের শেরশাহ সুরি রোডের চারটি বস্তি ঘরের রিজিয়া বেগম, রাশেদা বেগম, সাবেরা বেগম, নাসিমা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, আনোয়ারা খাতুন, ময়ফুল খাতুন, আনোয়ারা খাতুন-২, হাবিবুর রহমান, আব্দুল্লাহ, রফিকুল, শাহাবুদ্দীন ও আমিদ্দীন।

এদিন স্থানীয় থানার নির্দেশে নিহতদের মাটিচাপা দিয়ে কবর দেওয়া হয়। সেই ভয়ার্ত সকালে শরীফুল হক ডালিম বেতার ভবন দখলে নিয়ে খুনের সেই কুৎসিত সংবাদটি দেশবাসীকে জানায়। এ সময় তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে ডালিমের বন্ধু আপেল মাহমুদ। খান আতা বেতারে ঐ দিন খুনিদের 'সূর্য সন্তান' আখ্যায়িত করে গান লেখে। ভাষণ দেয় খোন্দকার মোশতাক। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় মোশতাকের অবৈধ শাসন ক্ষমতা দখলের মহড়া।

ঐ দিন বঙ্গবন্ধু ছাড়া আগস্টের নিহত সবাইকে বনানী কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। আর বঙ্গবন্ধুকে একদিন পর টুঙ্গিপাড়ায় কবর দেওয়া হয়। সেদিন ছিল ১৬ই আগস্ট। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, খোন্দকার মোশতাক সেপ্টেম্বরে ফারুক, রশীদ, ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহীউদ্দীন গংদের খুনের দায় থেকে অব্যাহতির এক অধ্যাদেশ জারি করে।

এর পরবর্তী ঘটনা দেশবাসীর জানা। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্যদের হত্যার বাধা দূর করে এবং সুদীর্ঘ ৩৪ বছর পর খুনিদের বিচার করে ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারি ফাঁসি কার্যকর করা হয় ৫ জনের। এ মামলার বিচার করেন জেলা জজ কাজী গোলাম রাসুল। আইও ছিলেন এ.এস.পি আবদুল কাহার আকন্দ। মামলার বাদী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহকারী মহিতুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষের মুখ্য কৌশলী ছিলেন সিরাজুল হক। সাক্ষ্য প্রদান করেন ৬১ জন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের সেই ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হয়। আজও লুকিয়ে থাকা বা পালিয়ে থাকা খুনিদের দণ্ড দেওয়া যায়নি। তবে বাংলার মাটিতে খুনিদের বিচার হয়েছে, এটাই ইতিহাসের অমোঘ সত্য। বিচারের বাণী কখনও নিভৃতে কাঁদে না। মিথ্যা ও অসত্য বিধাতার মিজানের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য। যা গোটা বিশ্ব অবলোকন করেছে। ২০০৮ থেকে আমরা সেই বিচারের কার্যক্রম ও একাত্তরের খুনিদের বিচার দেখেছি। গত ধারাবাহিক তিনটি পর্বের শাসনামলে শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারের কর্মকাণ্ডই স্মরণ করিয়ে দেয়– আগস্ট হত্যার বিচারে অসীম দৃঢ়তা, অটুট মনোবল ও দেশ এবং জাতির জন্য পিতার মতো প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ও সাহস জুগিয়েছে। এ দেশের মানুষের জন্য তাঁর পথচলা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তিনি দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি সেনা শাসন থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোটা বিশ্বে শেখ হাসিনা তথা বাংলাদেশের কত সুনাম। তাঁর সরকারের বদৌলতেই দেশ উন্নয়নশীল ধাপের কাছাকাছি।

আমরা পদ্মাসেতু, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল ও টানেল নিয়ে যেমন গর্ব করতে পারি, তেমনি পারি আমাদের জীবনের সার্বিক উন্নয়নে শেখ হাসিনার স্বপ্ন নিয়ে। আমরা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় স্বনির্ভর। ইতোমধ্যে তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ২০৪১ সালে আমাদের উত্তরাধিকারীরা তা নিয়েও গর্ব করবে। গর্ব করবে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ পালনের কথা শুনে।

পনেরোই আগস্টের চেতনা বেদনাময় হলেও সেই বিচারের মানসিক শক্তি দেশবাসীকে দিয়েছে দেশ গড়ার সাহস। সেই সাহসের মূলভিত্তি গ্রামীণ অর্থনীতি। সেই অর্থনীতি দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে দিয়েছে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তাসহ বেঁচে থাকার নতুন দিগন্ত। এই দিগন্তের প্রদীপ এক অভিযাত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। আগস্টের বেদনা বুকে ধারণ করেই দেশবাসীর জন্য তাঁর উৎসর্গিত প্রাণ এবং সকল কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সরণিতে আমরা তাঁর স্বপ্নসারথি। আগস্টের শোক এখন আমাদের শক্তি ও দেশ গড়ার প্রেরণা।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: সাহিত্যিক, গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

নিবন্ধ

নজরুলের ছিন্ন তরণী

প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান

কোনো কোনো বিষয় একাধিক বিষয়ের বিষয়মুখ। সেই অর্থে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি সাধারণ নয়, এক অর্থে একটু ভিন্ন এবং প্রসঙ্গটিও ছিন্ন ছিন্ন। এখানে-ওখানে পাওয়া। মোটা দাগে তা "নজরুলের 'প্রশস্তি-কবিতা' বিষয়ক", তবে তার কিছু বর্ধন গ্রহণ করা হবে, অর্থাৎ সম্পৃক্ত আরও কিছু কথাও যুক্ত হবে। সুতরাং তা শিরোনাম নির্দিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম রচিত *নানা প্রসঙ্গে নজরুল* গ্রন্থের সূচনা প্রবন্ধটিই কিছুটা বিস্তৃতিতে আলোচিত হবে, তবে দৃষ্টিটি (ফোকাস) সেখানেই সীমিত না রেখে কিছুটা বাড়িয়ে নিতে চাই, অথচ তা একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গও নয়। বৈচিত্র্যরূপে হয়ত তাকে ধরা যায়, কিন্তু সেটাই এর প্রধান বিষয় নয়, যে যাঁর (genre) নিয়ে কথা হচ্ছে, তার প্রকৃতিতেই একটা পরিবর্ধনের বিষয় আছে বলে সেটাকেও আলোচনায় প্রাসঙ্গিক ধরা হবে।

আমাদের লক্ষ্য কবির (নজরুল) সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট করা। কবি সমসাময়িককালে কী ধরনের রচনায় মগ্ন ছিলেন এবং কোন ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে অনুরাগী ছিলেন, সেটাও বুঝে নিতে চাই। অবশ্য এখানে ভাষাতত্ত্বে যাকে 'করপাস' বা অবয়বাংশ তথা ভাষার খণ্ড খণ্ড অংশ যেমন অনুবাক্য, উপবাক্য, শব্দরূপ এমনকি ধ্বনিরূপ প্রভৃতিরও বিশ্লেষণ (Corpus Analysis) বলে (এটা পরিগণক বা কম্পিউটার টেকনোলজির অগ্রগতির একটি ধারা। একে তাই 'মেশিন রিডেবল টেক্সট'ও বলা হয়)। এর বিশ্লেষণ-মডেল দেখা যায়, ভারতের নীলাদ্রি শেখর দাশ, বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী প্রমুখের প্রবন্ধে বা আলোচনায়। নজরুলের শব্দপঞ্জি এবং পুরাণ ব্যবহার নিয়ে 'উত্তরাধিকার' ও অন্যত্র আমার কিছু সাধারণ বা নন-টেকনিক্যাল আলোচনা আছে বটে, তবে নজরুলের করপাস নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনার সময় এখন আগত, আমাদের তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যান্য উপাদানের পাশে word string বা একের অধিক শব্দযোজন এবং শব্দবিন্যাসের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক (rationalistic & empirical) নির্মাণ কৌশল এবং তারও অধিক অনুসন্ধানযোগ্য 'রিট্রাইভিং টপিক্যাল ইনফরমেশন' সংযোগকরণের প্রক্রিয়াকেও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদেশে এই সহস্রাব্দের গোড়ায় বটলি ও অন্যান্য পাঠ বা শব্দের সাথে সম্পৃক্ত সকল তথ্য ও সূত্রকেই এক্ষেত্রে সমান্তরাল বিষয় বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। (parallel corpora of paired or related language put to alignment referring to various linguistic techniques) বিষয়টির গুরুত্ব যাই থাক, আপাতত আমাদের লক্ষ্য সেই দিকে নয়, তবে পাঠককে সচেতন করাও আমাদের একটি উদ্দেশ্য। কেবল পাঠ বা টেক্সট নয়, করপরাসের প্রতিও মনোযোগ এখানে বিশেষ উপজীব্য। কেননা, উপাদানের প্রকৃতিই বাক্যসৃষ্টির মূল ও কথিত করপরা-সমন্বয়নের বৈচিত্র্য বা word string-এর ধারণা স্থির করে, নির্মাণ করে তার প্রকরণ। সেখানেই বিষয় (কনটেন্ট) বর্ধনের একটা রূপ নেয়, যেমন এখানে 'প্রশস্তি' তার অনন্যতাজনিত বৈচিত্র্য নিয়ে প্রসারতা গ্রহণ করেছে। অতএব উৎসর্গপত্র, অটোগ্রাফ ও সমাধিলিপির সবর্ণতা স্বীকার করে নিয়েই এই আলোচনা।

২. প্রশস্তি ও উৎসর্গে নজরুল

বাংলাদেশ ও ভারতে বাংলা ও ইংরেজিতে 'বিদ্রোহী কবি'কে নিয়ে অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। নজরুল সাহিত্যের প্রথম আলোচনা কাজী আবদুল ওদুদ অথবা আজহারউদ্দীন খান বা আবদুল আজিজ আল আমান– যেই লিখে থাকুন, তাঁর রচনাবলি নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনা ছিল *মাহেনও* সম্পাদক সনেটকার আবদুল কাদিরের। পরবর্তীকালে হারুনুর রশিদের উদ্যোগে আনিসুজ্জামান ও অন্যান্যের সম্পাদনায় (তার মধ্যে আমি অন্যতম) গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ পায় (১৯৭৫/১৯৮৩)। পাশাপাশি অন্যান্য আলোচনা বা গ্রন্থরাজিও অজস্র প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে নজরুলের কয়েকটি বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের *নানা প্রসঙ্গে নজরুল* শিরোনামে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি (২০০২) ১৭টি প্রবন্ধের একটি ব্যতিক্রমী সংকলন। আলোচনার পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলোর শিরোনামসমূহ উল্লেখ করা হলো:

নানা প্রসঙ্গে নজরুল, ২০০২

[উৎসর্গ, প্রসঙ্গ কথা, ভূমিকা, সূচি, আলোকচিত্র, প্রচ্ছদচিত্র, পত্রিকার চিত্র, ডাকটিকিটে নজরুল। প্রবন্ধ: ২৯-২৯৬]

প্রবন্ধ সূচি: নজরুল রচিত প্রশস্তি-কবিতা ২৯/ সমকালীন গ্রন্থ সমালোচনায় নজরুলের রচনাবলী ৫৯ / নজরুল চর্চার ধারা ও প্রকৃতি ৭৬ / ঢাকা কেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চায় নজরুল ৯৫ / নজরুলের চিঠিপত্র প্রসঙ্গ ১১৭/ নজরুলের অভিভাষণ ১৪৯/ কাজী নজরুল ইসলাম ও 'মোসলেম ভারত' ১৬২/ নজরুলের সাংবাদিক জীবন ১৯৭/ 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা: পাঠান্তর প্রসঙ্গ ২০৪/ নজরুল ইসলামের আলোকচিত্র ২৩৬/ নজরুল গ্রন্থের প্রচ্ছদ ২৪৪/ 'বেঙ্গল লাইব্রেরী' ও কাজী নজরুল ইসলাম ২৫২/

নজরুল-সাহিত্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি ২৬২/ নজরুল সাহিত্যে লোকজ উপাদান ২৭০/ নজরুল-গীতিতে ভাব ও সুরের বৈচিত্র্য ২৭৬/ নজরুল জয়ন্তী ২৮১/ ডাকটিকিটে নজরুল ২৯০।

গ্রন্থের একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে। কৌতূহলী পাঠক মূল আলোচনাসমূহ পাঠ করে নিলে উপকৃত হতে পারবেন।

আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় প্রশস্তিমূলক (Tributory, Eulogy, panegyric) কবিতা। আলোচ্য গ্রন্থের ২৯-৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে নজরুলকৃত প্রশস্তিমূলক কবিতার আলোচনা (প্রথম প্রবন্ধ), যার পরে ছকভিত্তিক শ্রেণিভাগও আছে। ইংরেজিতে এই ধরনের কবিতাকে 'শর্ট লডেটরি হাইম'ও বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য 'ওড' (লিরিক) কিংবা 'এলিজি'র কাছাকাছি হলেও আকৃতি (গঠনরূপ) ও ভাবে তাদের অপেক্ষা ভিন্ন।

গ্রন্থের ৫৩-৫৬ পৃষ্ঠায় নজরুলের এই প্রশস্তি-কবিতার (৪৩টি) একটি ছক দেওয়া হয়েছে। তাতে কবিতাগুলোর তিনটি ভাগ লক্ষ করা যায়। যথা: ১. 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' পর্যায়ের অর্থাৎ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মূলক ১৩টি কবিতা, ২. শোকজ্ঞাপন বা 'প্রয়াণগীতি' পর্যায়ের ২৫টি কবিতা এবং ৩. 'উৎসর্গ' পর্যায়ের ৫টি কবিতা। প্রতিটি কবিতারই শিরোনামে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

'প্রশস্তি-কবিতা' মধ্যযুগে দেবপ্রশস্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই প্রশস্তি মঙ্গলার্থ। দেবখণ্ড ছাড়াও প্রশস্তির অন্যান্য রূপও লক্ষ করা গেছে। প্রশস্তির আধুনিক রূপ মাইকেল, তার সনেটে। নজরুলে পাই তার আর এক রূপ। কিছু কবিতা তাঁর জননী-লক্ষ্য, কিছু কবিতা কবি-সাহিত্যিক-সংগীতজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ মুখ্য, আর অধিকাংশই রাজনীতিবিদ ও সংস্কারক বা ব্যক্তিস্মারক। শুধু গুণকীর্তনই নয়, এই প্রশস্তির মধ্য দিয়ে নজরুল সমকালকেও তুলে এনেছেন, ধারণ করেছেন আপন দর্শনকেও, যেখানে আছে অসাম্প্রদায়িকতা, প্রতিবাদী আলো এবং প্রেমাত্মতা। কোনো কোনো কবিতা উৎসর্গমূলক এবং গীতাত্মক, যেমন তিলক কামোদ সুরে ঝাঁপতালে লেখা '*অগ্নিবীণা*'র উৎসর্গ রচনাটি (ভাঙা বাংলার রঙিন যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীচরণারবিন্দেষু)।

লেখক যে ছক বা সারণিটি নির্মাণ করেছেন তা প্রায় এই রূপ:

কবিতা/শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিতা/প্রয়াণ-গীতি/উৎসর্গ কবিতা/পরিচিতি।

কবিতাগুলোর পরিচয় লেখক উল্লিখিত ছকবন্দিরূপে দিলেও এখানে ভিন্নরূপে সাজানো হলো।

ক. শ্রদ্ধাঞ্জলি (মোট কবিতা সংখ্যা ১৩টি)

১। 'দিল দরদী' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি), ২। 'পূর্ণ অভিনন্দন' (পূর্ণচন্দ্র দাস, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব) ৩। 'সুরকুমার' (দিলীপকুমার রায়), ৪। 'সুরের দুলাল' (ঐ), ৫। 'আশীর্বাদ' (শামসুন্নাহার, 'পূণ্যময়ী'র লেখিকা), ৬। 'গান': কোন শরতে (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক), ৭। 'শরৎচন্দ্র' (ঐ, ঐ), ৮। 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি-সাহিত্যিক), ৯। 'তীর্থ পথিক' (ঐ, ঐ) ১০। 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি' (ঐ, ঐ), ১১। 'কিশোর রবি' (ঐ, ঐ), ১২। 'গান', শুধু নদী যার নহ তুমি (খান বাহাদুর আজিজুল হক), ১৩। 'গান': তুমি কোন পথে এলে (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর ৪ জন কবি ও লেখকের উদ্দেশে ৫টি, সংগীতজ্ঞ দিলীপ রায়কে নিয়ে ২টি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ৪টি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদকে নিয়ে ২টি।

খ. প্রয়াণ-গীতি (মোট রচনা ২৫টি)

১। 'সত্যেন্দ্র প্রয়াণ' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি), ২। 'সত্য কবি' (ঐ, ঐ), ৩। 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণগীতি' (ঐ, ঐ), ৪। 'আশু-প্রয়াণ গীতি' (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ ও আইনজ্ঞ), ৫। 'মিসেস এম. রহমান' (মিসেস এম. রহমান, নারীবাদী সাহিত্যিক ও নজরুলের জননীস্বরূপা), ৬। 'অর্ঘ্য' (চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ৭। 'অকাল সন্ধ্যা' (চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ৮। 'ইন্দ্রপতন' (চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ৯। 'রাজভিখারী' (চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ১০। 'সান্ত্বনা' (চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ১১। 'অর্পণ' (চিত্তরঞ্জন দাস–শ্রাদ্ধ উপলক্ষে; রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ১২। 'গোকুল নাগ' (গোকুল নাগ, সাহিত্যিক), ১৩। 'অশ্বিনীকুমার' (অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক), ১৪। 'শরদিন্দু রায়' (কবি), ১৫। 'রবি-হারা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি, সাহিত্যিক), ১৬। 'সালাম অস্তরবি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি-সাহিত্যিক), ১৭। 'বাংলার আজিজ' (খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, শিক্ষাবিদ), ১৮। 'মণীন্দ্র প্রয়াণ' (মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দানশীল জমিদার), ১৯। 'যতীন দাস' (যতীন্দ্রনাথ দাস, বিপ্লবী পুরুষ), ২০। 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধান' (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী), ২১। 'নবভারতের হলদিঘাট' (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী পুরুষ), ২২। 'মোহসীন' (হাজী মোহাম্মদ মোহ্সীন, দানশীল), ২৩। 'গান' (ঐ, ঐ), ২৪। 'নবীনচন্দ্র' (নবীনচন্দ্র সেন, কবি), ২৫। 'গান': জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী (সমাজসংস্কারক)।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর তিনজন কবি ও লেখকের উদ্দেশে ৫টি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২টি, চারজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ৮টি, এক নারীকে নিয়ে ১টি, দুইজন শিক্ষাবিদকে নিয়ে ২টি, তিনজন সাহিত্যিক ও বিপ্লবী সাহিত্যিককে নিয়ে ৩টি, দুইজন দানশীলব্যক্তি ও ব্যবসায়ীকে নিয়ে ৩টি এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে ১টি রচনা আছে।

গ. উৎসর্গ কবিতা (মোট রচনা সংখ্যা ৫টি)

১। উৎসর্গ কবিতা: 'অগ্নিবীণা' (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপ্লবী সাহিত্যিক), ২। উৎসর্গ কবিতা: 'বিষের বাঁশী' (মিসেস এম. রহমান, মুসলিম মহিলা কুলগৌরব ও নজরুলের 'জননীস্বরূপা'), ৩। উৎসর্গ কবিতা: 'সর্বহারা' (বিরজা সুন্দরী দেবী, মাতৃস্বরূপা কবি-শুভার্থী) ৪। উৎসর্গ কবিতা: 'বাঁধনহারা' (নলিনীকান্ত সরকার, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ), ৫। উৎসর্গ পত্র: 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (বুলবুল, পুত্র)।

সর্বমোট কবিতা সংখ্যা ৪৩টি। (১৩+২৫+৫)। এই ৪৩ জন ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে তাঁর শিশুপুত্র বুলবুল (১) এবং রবীন্দ্রনাথ (৬), সত্যেন্দ্রনাথ (৪) ও শরৎচন্দ্র (৩) বাদে ৫ জন কবি, ১৩ জন (৩+১০) রাজনীতিবিদ ও বিপ্লবী পুরুষ, ৪ জন সংগীতজ্ঞ, ৫ জন বাকি এবং অন্যান্য সাহিত্যিক ও বিশেষ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫ জন নারী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম ব্যক্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় ৭ জনের ১০ বার।

এই ক্ষণ রচনার কণিকাসমূহ যদি কোনো যাঁর (genre) রচনা করে থাকে, তবে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-সম্পৃক্ত ব্যক্তি-সম্পর্কগুলো 'parallel corpora' ও তার বর্ধনের বিষয়। কলকাতা থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও নজরুল কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এখানেই তা স্পষ্ট হয়। 'প্রশস্তি'র উৎস এখানে সমকালের 'সম্পর্ক' এবং 'ইতিহাস-চেতনা'। এ কারণে বর্ধনেরও প্রশ্ন।

৩.

এই গ্রন্থে যে সব ব্যক্তিত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের কাছে নজরুলও সমভাবেই সমাদৃত ছিলেন, হয়েছিলেন সম্মানের পাত্র। এই গৌরবান্বিত অবস্থান থেকে নজরুলকে আর একটি পরিচয়ে আমরা লক্ষ করতে পারি। তবে সমাজ আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েই মানুষকে বিচার করে থাকে। প্রকাশকদের কল্যাণে এক সময় নজরুল মোটরগাড়ির অধিকারী হয়ে উঠলেও, ভক্ত-শিশুদের নিয়ে কলকাতা শহর ঘুরলেও (সিনেমার 'দামু কাকা'র শিশুকে হাতি চড়ানোর কথা মনে পড়ে যাবে হয়তবা), তবু নজরুল তো প্রয়োজনের সময় নিজের চিকিৎসা করাতে পারেননি অর্থাভাবেই। এখানে আমার জানা একটি ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিকও হতে পারে। বাল্যকালে বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা ও সংবাদ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৈয়দ রশীদ আহমদ (সিপিবি) কলকাতায় নজরুলের একই পাড়ায় থাকাকালে একটি অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা তোলার সময় বন্ধুদের নিয়ে প্রতিবেশী কবি নজরুলের কাছেও সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন; তখন নজরুল তাদের বলেছিলেন, আমারতো খাবারেরই পয়সা নেই, তো তোমাদের আমি একটি কবিতা লিখে দিতে পারি, যদি চাও। বালক রশীদ কবিতা নিয়ে কী করবে ভেবে চলে এসেছিল। পরে তিনি আফসোসে ভুগেছিলেন সারা জীবন।

নজরুল অনেককেই দু'লাইন লিখে স্বাক্ষর করে দিতেন। (অটোগ্রাফ) শওকত ওসমানকেও দিয়েছিলেন। তিনি সেটা তাঁর বসার ঘরের দেয়ালে বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আমি নজরুল ইনস্টিটিউটে যোগদান করার পর কদিন তাঁর বাসায় গেলে তিনি সেই লেখাটি আমাকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দেন। অমি ইনস্টিটিউট থেকে চলে আসার সময় সেটি ইনস্টিটিউকেই দিয়ে আসি। এইভাবে নজরুল অনেকের সমাধিলিপিও লিখেছেন বলে আমি অনুমান করি। আমার বাবা ব্রিটিশ পিরিয়ডে পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। ছাত্রজীবনে ঢাকার নওয়াব বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি ভালো ইংরেজি ও ফার্সি জানতেন বলে বাড়ির মওলানা তাঁকে কিছুদিন নাজিমউদ্দিন সাহেবকে পড়াবার জন্য নিযুক্ত করেন। নওয়াব সাহেব মন্ত্রী থাকাকালে একবার রায়টের সময় আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন। তাছাড়া আমাদের এলাকাটা ছিল নওয়াব সেলিমের কনস্টিটিউয়েন্সি। যাই হোক, নজরুলকে ব্রিটিশ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে বাবা খুব চেষ্টা করতেন। সাহিত্যমনা বাবা তখন চব্বিশ পরগণায় (বসিরহাট, বারাসাত, ব্যারাকপুর, হাড়োয়া) বেঙ্গল পুলিশে ছিলেন বিধায় মুসলমান বিপ্লবী ও পরিচিত সংগ্রামীদের তিনি গোপনে সাহায্য করে প্রমোশনও হারান। এই সময়ে কবি শাহাদত হোসেনের সাথে নজরুল আমাদের বাসায় (হাড়োয়া অথবা হাওড়ায়) আসতেন এবং খাওয়াদাওয়াও করতেন। আমার মা এবং বড়ো বুজানের কাছে শুনেছি নজরুল মার হাতের রান্না, বিশেষ করে গরুর গোস্ত খুব পছন্দ করতেন। আমাদের একটা বড়ো জামবাটি ছিল। সেটা দেখিয়ে মা বলেছিলেন, এটা ভর্তি করে মাংস দিলে তিনি খুব খুশি হতেন।

আমার দাদাজান তালুকদার হাড়াই ভূঞা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তখন হাড়োয়াতে আমাদের বাসায় চিকিৎসার জন্য এসে কিছুদিন ছিলেন। নজরুল তাঁকে বিধান রায়ের কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। দাদাজান আরবি-ফার্সির লোক ছিলেন। শোনা যায়, তিনিই তাঁকে *কোরান* অনুবাদের (আমপারা) কথা বলেন। দাদাজান মারা গেলে নজরুলের কথায় তাঁকে ব্যারাকপুরের কর্পোরেশনের কবরস্থানে মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয় এবং কবি তাঁর সমাধিলিপি লিখে দেন। সেটি এই–

ঢাকার আদিয়াবাদে লভিয়া জনম
শায়িত হাড়াই-ভূঞা শয়নে চরম
এ দূর প্রবাসে এই সমাধি বিজনে
মুক্তি মাগ পান্থ তার অনন্ত জীবনে ॥
(মৃত্যু: ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

মৃত্যুর সনটি আমার বড়ো দুলাভাই পরে লিখে দেন। তিনি (অধ্যাপক এম.এ. তাহের) আলীগড়ের এম.এ. ও *স্টেটসম্যানের* কলামিস্ট এবং পরে জগন্নাথ কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, বাবার অপর বন্ধু কবি শাহাদত হোসেন নজরুলের কাছ থেকে লেখাটি নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় নরসিংদীর আদিয়াবাদ ঢাকা জেলার অধীনে ছিল। পূর্বে উল্লিখিত সৈয়দ রশীদ আহমদের আত্মীয় ও আমাদের গ্রামের এক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুস সোবহান স্বাধীনতার পর ব্যারাকপুরে বেড়াতে গেলে মসজিদের গেটের পাশেই কবরটি সমাধিলিপিসহ দেখতে পান এবং তার ছবি তুলে এনে আমাকে দেন। সেখান থেকেই চরণগুলো উদ্ধৃত হলো।

নজরুলের বিচিত্র লেখার সাথে এই সব লেখার সাহিত্যিক মূল্য হয়ত তেমন নেই, কিন্তু কবিকে জানার জন্য এর মূল পর্বে উল্লিখিত সৈয়দ রশীদ আহমদের বাল্যকালে নজরুলের স্বেচ্ছায় দিতে চাওয়া ও তাঁর না নেওয়া লেখার মতোই পরে কষ্টের বিষয় হয়ে ওঠে। শুধু প্রশস্তিই নয়, পরিচিতি দানের বা অটোগ্রাফের বিষয়গুলো, যদি আরও কিছু থাকে, আমাদের খুঁজে দেখা দরকার। কেননা টাকার মূল্য দু'পিঠেই।

প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এবং নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশচিন্তা ও স্মার্ট বাংলাদেশ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাল্যকাল থেকেই রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়েই চিন্তাভাবনা করতেন। সর্বদা এই বঙ্গভূমির উন্নতিকল্পে ভাবতেন; কী করলে স্বদেশ ভূমির মানুষের কল্যাণ হবে তা-ই করার চেষ্টা করতেন। স্বদেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, স্বদেশের মাটির প্রতি প্রগাঢ় টান অনুভব করতেন তিনি প্রতি মুহূর্তে।

বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা যিনি তাঁর শৈশবকাল থেকেই তিল তিল করে নিজেকে তৈরি করেছেন দেশের ও দেশের মানুষের সেবা করার জন্য। তিনি অতি সহজেই অনাথ-অসহায়, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। রাজনীতির নামে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কীভাবে শোষণ করছে, গরিবের জমিজমা ও ফসল লুটে নিচ্ছে তা তিনি নির্দ্বিধায় মানুষদের জানিয়ে দিতেন। সাধারণ মানুষদের পাশে থেকে তাদের অধিকার আদায়ে সাহস জোগাতেন। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং দাবি আদায়ের জন্য তাদের হয়ে লড়াই করেছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বাঙালির শাশ্বত ঐতিহ্যই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ ভাবনার মূল ভিত্তি। আর সে কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আর গ্রামগঞ্জ, শহর-নগরের আপামর জনমানবের নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার পরিচয়ে সব সময় ছিলেন আপোশহীন। তাইতো পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাদের মুখের ওপর উচ্চারণ করেছিলেন– আমাদের ভূখণ্ডকে পূর্ব পাকিস্তান না বলে পূর্ব বাংলা বলুন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন– আমার প্রিয় জন্মভূমির নাম রাখা হবে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভের আগেই তিনি দেশের নাম নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি দেশজুড়ে বিভিন্ন সময়ে প্রদান করা ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার মৌল-মানবিক অধিকারের বাণী।

একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাদান এবং রাষ্ট্রটির জন্য নীতিমালা ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণের পেছনে বঙ্গবন্ধুর যে অনুষঙ্গটি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা হলো তাঁর অপরিমেয় স্বদেশপ্রেম। সেই স্বদেশপ্রেম থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। স্বদেশপ্রেমের আবেগেই তিনি প্রথম যৌবনে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাকিস্তানিদের কূটচাল অতি সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। দেশপ্রেম বলতে তো নিজ দেশের মাটি, মানুষ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সামগ্রিক জীবনাচার– এই সবগুলোর প্রতিই প্রগাঢ় আকর্ষণ, অসম্ভব অনুরাগকে বোঝায়। সেসব অনুভূতি থেকে এবং তাঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে অতি সহজেই তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি অপ্রাকৃতিক ও উদ্ভট রাষ্ট্রের করতল থেকে বিমুক্ত করতে না পারলে স্বদেশের পরিত্রাণ ঘটবে না।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। ১৯৪৮ সালে যখন বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত এলো, তখন থেকেই বিষয়টি তাঁর চেতনাকে আলোড়িত করতে শুরু করেছিল। বঙ্গবন্ধু সেই লক্ষ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন ১৯৬৬'র ছয় দফা ঘোষণায়, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানে এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানিদের কুপোকাত করে মহান বিজয় অর্জন করার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশই হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র। বাঙালির এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে কেন্দ্র করেই এর স্থপতি বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তার বহুমুখী উৎসারণ ঘটতে থাকে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাই হয়েছিল ভাষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীতে সেই বাঙালির জাতি রাষ্ট্রটির প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষাই করা হলো না, বঙ্গবন্ধু

জাতিসংঘেও বাংলা ভাষাতেই ভাষণদান করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এসব কিছুর ভেতর দিয়ে স্পষ্টতই লক্ষ করা গেছে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। বাংলা ভাষাকে, বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতিকে এবং বাংলার মানুষের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ ভাবনার মূল কার্যবস্তু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি এবং মুক্তি পাওয়ার পরই প্রথমে তিনি লন্ডন ও পরে নয়াদিল্লি সফর করেন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। ১০ই জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দরে অবতরণ করেই সরাসরি চলে যান তাঁর জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অপেক্ষমাণ লাখো বীর বাঙালির কাছে; সেদিনই তাঁকে লাখ লাখ বাঙালির মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে বীরোচিত সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

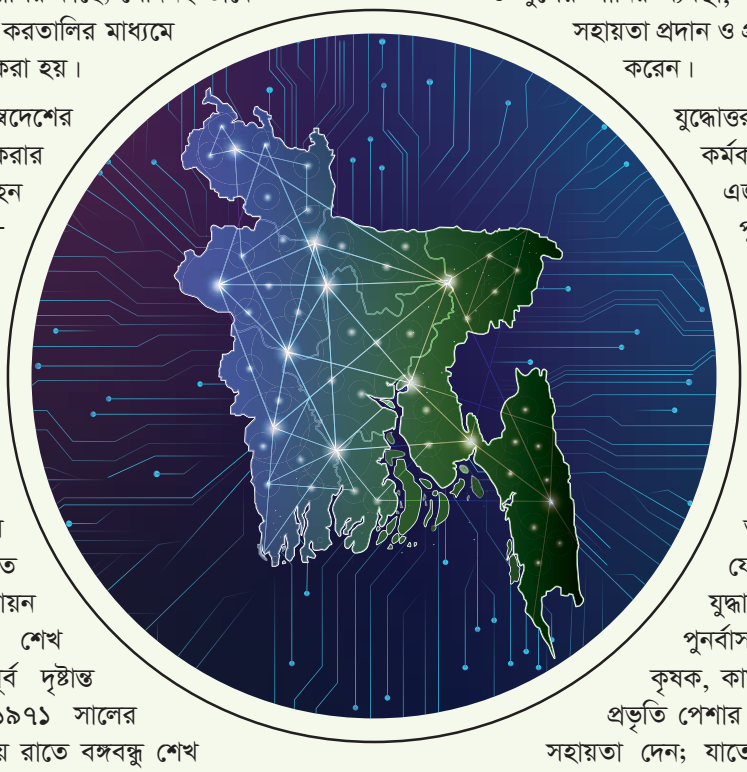

দেশের মাটিতে পা রেখে স্বদেশের দায়িত্বভার শিরোধার্য করার পরপরই তিনি লিপ্ত হন আরেক চ্যালেঞ্জিং মহারণে– যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশকে পুনর্গঠন করতে। তিনি আমৃত্যু বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াই-সংগ্রামসহ সব ধরনের কাজ করে গেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সাড়ে তিন বছরের স্বল্প সময়ে তুলনামূলক এত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভবপর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস পাকিস্তানে কারান্তরিন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার আত্মজীবনী *ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স* গ্রন্থে লিখেন, শেখ মুজিব নয় মাস কারাগারে থাকা অবস্থায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে। প্রতিপক্ষ প্রধানের লেখনীতে এমন নিগূঢ় সত্যকথা প্রকাশের মাধ্যমে অতি সহজেই প্রমাণিত হয় যে, নির্জন কারাবাসকালে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনাজুড়ে বিচরণ করত তাঁর দেশ ভাবনা। নিজের মাতৃভূমিকে কীভাবে তিনি গড়ে তুলবেন, কীভাবে একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে নানামুখী পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করবেন, কেমন হবে অবশ্যম্ভাবী দেশটির পরিচালন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, কতদিনে ও কী কী উপায়ে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে অন্তপ্রায় দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবেন– এই ছিল জেল জীবনে নিঃসঙ্গ-একাকী বঙ্গবন্ধুর নৈমিত্তিক ভাবনা ও পরিকল্পনা।

সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসন, শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনর্গঠন, যুদ্ধাপরাধী বন্দিদের বিচার, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর প্রত্যর্পণ ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। তিনি অতি অল্প সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিল্প, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা, খাদ্য ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন।

যুদ্ধোত্তর দেশে ব্যাপক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডও হাতে নেন বঙ্গবন্ধু। এজন্য সব পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। গৃহহীনদের আবাসন সুবিধা, জরুরি ভিত্তিতে নগদ অর্থ প্রদান, খাদ্য সহায়তা, শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে আর্থিক সহায়তা, মহকুমা সদরে অভিভাবকহীন নারীদের আশ্রয় প্রদান, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি পেশার মানুষদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা দেন; যাতে তারা নিজ নিজ পেশা অব্যাহত রাখতে পারেন।

একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান প্রণয়নের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। বঙ্গবন্ধু অস্ত্র জমাদান, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্তীকরণ, সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। অন্যদিকে ট্যাংকসহ আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেন। বিমানবাহিনীর জন্য বারোটি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, রাডার, এ এন-২৪ ও ২৬ বিমান, এম আই-৮ হেলিকপ্টার সংগ্রহ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের তিনটি নৌঘাঁটি স্থাপন ও বানৌজা পদ্মা, বিষখালী, নোয়াখালী, পাবনা, এম আর আমিন, সুরমা, পটুয়াখালী, কর্ণফুলী ও তিস্তা নামে যুদ্ধজাহাজ যুক্ত করেন। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে উৎপাদন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করেন। উৎপাদন সচল করায় থোক অর্থ বরাদ্দ, কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত ও খাতভিত্তিক শিল্পকারখানার পুনরুজ্জীবন

ঘটান। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, মুদ্রা প্রবর্তন, আমদানি-রপ্তানি চালু, জনবান্ধব বাজেট প্রণয়ন, শিল্পকারখানা জাতীয়করণ, শিল্পায়ন খাতটিকে শিল্প বিনিয়োগ ঘোষণা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মাথাপিছু আয় ২ দশমিক ৫ ভাগ বৃদ্ধি, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, যুদ্ধকালীন বকেয়া ফি মওকুফ এবং দুই শিফ্‌টে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ও আণবিক শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এক কথায় দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য তাঁর সারাটা জীবন উৎসর্গ করেন।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়নের পর তাঁর সরকারকে 'ভিশন–২০৪১'-এর সাথে সঙ্গতি রেখে একটি নব উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার নতুন লক্ষ্য গ্রহণ করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে ও সরকারের নতুন রূপকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি সেবা সহজিকরণ করতে এটুআই বেশকিছু ডিজিটাল প্রোগ্রাম উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে মৌল মানবিক অধিকার প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ সুযোগ। প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী– স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি– এ চারটি মূলস্তম্ভের ওপর নির্ভর করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। এ বিবেচনায় ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নও ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ ২০২১ থেকে ২০৪১ পর্যন্ত সময়ে কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে তার একটি কাঠামো ও পূর্বপরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আশীর্বাদ বয়ে আনবে। অন্যদিকে ২০৪১ সালেই শেষ নয়, ২১০০ সালেও এ বঙ্গীয় বদ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয়, দেশের মানুষ যাতে সুন্দর, সুস্থ ও স্মার্টলি বাঁচতে পারে সেজন্য ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে মানুষ দেশের যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন, সে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে পাবেন, তখন শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে জীবনযাপন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না। ঢাকা নগরীর নাগরিক যেমন ঘরে বসেই সব কিছু করতে পারবে, তেমনি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও তাই করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের একজন নাগরিককে তার পাসপোর্ট নবায়নের জন্য কোনো অবস্থায়ই অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হবে না, সে তার গ্রামে বসেই আবেদন করবে, যা প্রযুক্তির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে আবেদনকারীর নতুন পাসপোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে তার নিকট পৌঁছে যাবে। তেমনিভাবে আয়কর রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা এমন হবে যে, সাধারণ জনগণ তার এলাকায় বসেই নিজেই নিজের রিটার্ন জমা দেবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়িত হয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমেই ধার্যকরণ নোটিশ করদাতার কাছে পৌঁছে যাবে, আয়কর কর্মকর্তার তেমন কোনো ভূমিকার প্রয়োজন এখানে হবে না, তারা অবশ্য স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে কে বা কারা আয়কর রিটার্ন জমা দেননি।

তাছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনীমূলক। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিমের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত গ্রিডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প–২০২১-এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে কাজ করছে। আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি হবে পরবর্তী উন্নয়নের মহাসড়ক।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার : কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

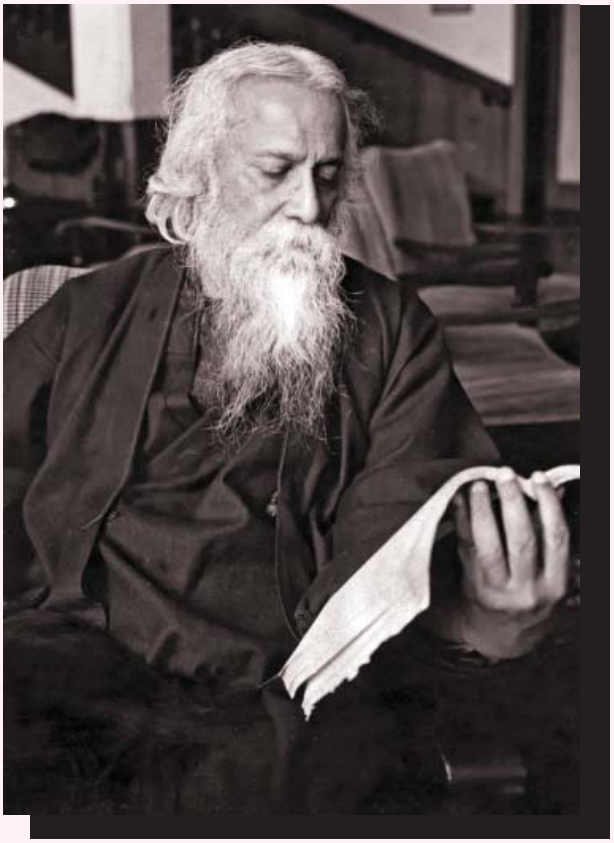

রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যুভাবনা

ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যুর স্থান এক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। *শেষ সপ্তক* কাব্যের উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেন,

ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।

কবি এ ক্ষেত্রে নির্ভয়ে মৃত্যুকে অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছেন। সতেরো বছর বয়সে কবি মৃত্যুকে নিয়ে প্রথম কবিতা লেখেন। তখন মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর কোনো গভীর উপলব্ধি ছিল না। এসময় তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন প্রেমিক হিসেবে। বাল্যকালেই তিনি মৃত্যুর মধ্যে অনাদিকালের শান্তি অনুভব করেছিলেন। বুঝেছিলেন মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, সে অমৃতময় শান্তির কেন্দ্র। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তিনি লিখেন,

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান ॥

সময় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কবির বয়স যখন চব্বিশ তখন তাঁর বৌদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় (১৮৮৪)। এই মৃত্যু তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। মৃত্যুর বিয়োগান্ত রূপের সঙ্গে পরিচয়ে জীবনের প্রতি মমতা বেড়ে যায়। সে জন্যই তিনি *কড়ি ও কোমল* কাব্যের 'প্রাণ' কবিতায় বলতে পারেন,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শুরুতে মৃত্যুকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন, তা বেশিদিন তিনি অব্যাহত রাখতে পারেননি। কারণ তাঁর জীবনে একের পর এক মৃত্যু ছায়া ফেলেছে। কবি পত্নী মৃণালিনী দেবী ১৯০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে একে একে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন আত্মজা রেনুকা (১৯০৩), পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ (১৯০৫), কনিষ্ঠ আত্মজ শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭)।

এ সব মর্মান্তিক বিচ্ছেদ বেদনার পরোক্ষ ছাপ পড়েছে খেয়া ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের কবিতায়।

(মাহবুবুল হক, বাংলা সাহিত্য: নানা নিবন্ধ, পৃ. ৫২-৫৩)

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আত্মজা মাধুরীলতার মৃত্যু (১৯১৮), অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯২৬), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯২৬) এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সব মৃত্যুকে দেখে তিনি মৃত্যু নিয়ে ভেবেছেন। এ সংক্রান্ত বোধের শিখরে উঠতে চেষ্টা করেছেন।

মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ জড়তার সাথে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডের আলোচনায় মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

ধর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থা পরিবর্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা।

মৃত্যু কী তা আমরা যারা জীবিত তারা জানি না। বিভিন্ন কবি, বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে মৃত্যুর স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবু সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, মৃত্যু বলতে আমরা একটা বিরাট শূন্যতা, সুগভীর নিস্তব্ধতাকেই বুঝি। চঞ্চল যেখানে চাঞ্চল্য হারিয়েছে, আলোক যেখানে দ্যুতি হারিয়েছে, জীবন যেখানে স্পন্দন হারিয়েছে, সেই বিরাট শূন্য জগৎ– তাকেই আমরা মৃত্যু বলে জানি।

রবীন্দ্র মানসে মৃত্যু বিভিন্ন সময় এবং পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছে। বাল্যকালেই তিনি মৃত্যুর মধ্যে অনাদিকালের শান্তি অনুভব করেছিলেন, বুঝেছিলেন মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, সে অমৃতময় শান্তির কেন্দ্র। তাইতো কবি পূরবী কাব্যের 'সুপ্রভাত' কবিতায় বলেন,

মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

এ কবিতায় কবি আবার একথাও বলেন,

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক দৃষ্টি নিয়েই এ পৃথিবীর সবকিছুকে ভালোবাসতেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বললেন, এ জগৎ স্বপ্নময় নয়, এ জগৎ সত্য। সেই রূপ জীবনটাই সত্য এবং মৃত্যুটা নিছক স্বপ্ন মাত্র। কবির কাছে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন দিকে তার প্রসারতা। ক্ষণে ক্ষণে সে তার মর্ত্যলোকের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। তাই জীবনের মধ্যে মৃত্যু এসে মানবজীবনকে সেই 'আনন্দলোকের' দ্বারে উত্তীর্ণ করে দেয়। মৃত্যুর পর সে পায় পরম শান্তি, চরম সান্ত্বনা। ইহলোকের সমস্ত দুঃখ-যাতনা, নিরাশা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' কবিতার ছত্রে ছত্রে কবির মৃত্যুভাবনার সুন্দর দ্যোতনা লক্ষ করা যায় :

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ-ভালোবাসা।
...

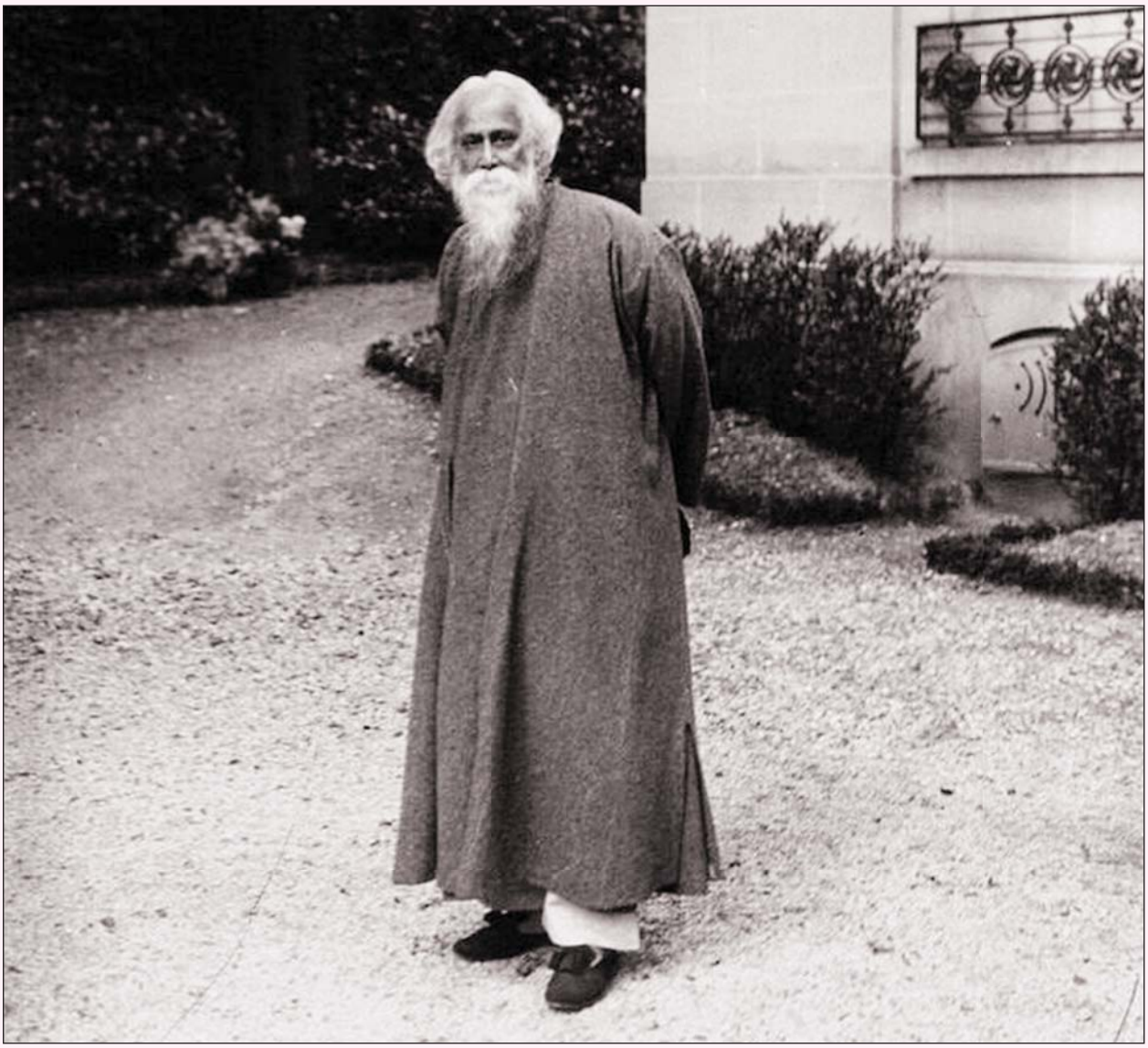

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক কিছুকাল
ভুবন মাঝারে।
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্তবাসর– দেশে
লইয়ো না তারে।
...
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে
এসো বরবেশে।

কণিকা কাব্যের 'মৃত্যু' কবিতায় কবি মৃত্যুর পরিপূর্ণ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেই–

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তবে বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

মৃত্যু সম্পর্কে কবির গভীরতর উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় শেষ সপ্তকের একাধিক কবিতায়। মৃত্যুকে এই সময় থেকে তিনি দেখেছেন জীবনের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে। মৃত্যু কবির চোখে এই জগতের বহমান গতিধারাকে নিরন্তর অব্যাহত রাখার এক অপরিহার্য দিক বিশেষ। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন পায় চলমানতার মহিমা:

আমি মৃত্যু– রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে
(৩৯ সংখ্যক কবিতা, শেষ সপ্তক)।

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বহু শোক সহ্য করতে হয়েছে, বহু মৃত্যু দেখেছেন চোখের সামনে। তাই ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃত্যুকে বিভিন্নরূপে দেখেছেন। প্রথম জীবনে তিনি মৃত্যুকে চির পরিচিত দোসররূপে মাধুর্যময় বলে জেনেছেন, পরবর্তী জীবন তার মধ্যে তিনি নবজীবনের সন্ধান পেয়েছেন। এই নবজীবনের ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে গেলে যে অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, সেই ভীষণ মধুরকে পেতে হলে– এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কিশোর বয়সে লেখা *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*র মরণের সঙ্গে উৎসর্গের 'মরণ' এবং 'মরণ দোলা' এবং শেষ জীবনের শেষ লেখার তুলনা করলে তা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি।

মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব উপলব্ধির প্রকাশ প্রথম লক্ষ করা যায় *প্রান্তিক* কাব্যগ্রন্থে। ১৯৩৭ সালে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় ভুগে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি যেন মৃত্যুস্নান করে ওঠেন। মৃত্যু ও মৃত্যু পেরিয়ে আসা জীবনের উপলব্ধি কাব্যবাণীতে ভাস্বর হয়েছে প্রান্তিকের বিভিন্ন কবিতায়। (মাহবুবুল হক, *বাংলা সাহিত্য: নানা নিবন্ধ*, পৃ. ৫৩)

জীবনের যে আনন্দ, যে মাধুরী, যে বিস্ময় বিজড়িত রয়েছে ওতপ্রোতরূপে প্রকৃতির সাথে, তাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছেন। কবি অনুভব করেন, জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা মৃত্যুরূপী রাহুর নেই:

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।
(২ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছেন ততই সম্যকরূপে তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম যৌবনে মরণকে শ্যাম সমান বলে মনে হয়েছিল, সে মনোভাব পরে দূর হয়েছে। প্রথম দিককার যৌবনের ভাববিহ্বলতা ও উচ্ছ্বাস আর পরবর্তী রচনায় নেই, আছে ঋষির পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ। মানুষের জীবন হচ্ছে দুঃখের মধ্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধির সাধন ক্ষেত্র। আর সে সাধনা চরমমূল্য পায় মৃত্যুতে:

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।
(১১ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর অন্তরের উপলব্ধির অভিব্যক্তি। তাই তার রূপ বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর ভাবনার মূল সুরটি প্রায় পূর্ববৎ ছিল। অর্থাৎ তাঁর রচনায় তাঁর প্রথম জীবনের আদর্শ ও তার রূপ পরবর্তী যুগে পরিণত রূপ ও আকার পেয়েছে মাত্র। তাঁর জীবন দর্শন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়নি। 'উৎসর্গ'-এ মহান মৃত্যুর প্রতি যে আকর্ষণ, কালিমাময় জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্যে যে ব্যাকুলতা, তা পরবর্তী প্রায় সব রচনাতেই বিদ্যমান।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এর আগের বছরে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন কাটান রোগ-যন্ত্রণায়, জীবন-মরণের সন্ধিলগ্নে। এই সময় মৃত্যুর সঙ্গে যেন তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়। তাঁর শেষের দিকের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে– *রোগশয্যায়* (১৯৪০), *আরোগ্য* (১৯৪০), *জন্মদিনে* (১৯৪১) ও *শেষ লেখায়* (১৯৪১) জীবন-মৃত্যুর এক গভীর দার্শনিক চেতনার সহজ প্রকাশ ঘটে। তাতে ফুটে ওঠে জীবন- মৃত্যুর এক গভীরতর সম্পর্কের দার্শনিক পরিচয় :

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান।
(২ সংখ্যক কবিতা, *রোগশয্যায়*)।

মরণ জীবনেরই বার্তা বহন করে আনে। তাই কবি মৃত্যুকে ভয় করেননি, অবিশ্বাস করেননি। তাই যতই আঘাত আসুক, ঝঞ্ঝা উঠুক পথে, তিনি সেই মহান মৃত্যুকেই বরণ করে নেবেন।

ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য : বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ধামরাই মডেল কলেজ, ধামরাই, ঢাকা

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব

কামরুন নাহার মুকুল

'র' এবং 'ণ' এই দুই অক্ষরের সমন্বয়ের একটি শব্দ 'রেণু'। 'রেণু' একটি নাম। নামটি অর্থবহ। রেণু শব্দের অর্থ 'পরাগ' অর্থাৎ 'পুষ্প রেণু'। পরাগায়নের মাধ্যমে যেমন ফুল-ফল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি আমাদের বঙ্গমাতা 'রেণু' তাঁর স্নেহ-মায়া ও ত্যাগের পরাগে বাঙালি জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। 'রেণু' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী। যাঁর পুরো নাম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। রেণু ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ জহিরুল হক এবং মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। তিন বছর বয়সে বাবাকে এবং পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারান। শৈশবে মা-বাবাকে হারানোর পর তাঁর দেখভাল করেন দাদা শেখ মো. আবুল কাশেম।

শেখ মো. আবুল কাশেম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতামহ শেখ আব্দুল হামিদের চাচাতো ভাই। দাদার ইচ্ছায় ১৯৩৮ সালে রেণুর তিন বছর বয়সে ১০ বছরের খোকার সঙ্গে বিয়ে হয়। খোকা সম্পর্কে তাঁর চাচাতো ভাই। খোকার বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা সায়ারা খাতুন ঘরে আনলেন এক কিশোরী বধূ। বধূ হয়ে এলেও রেণু তাঁদের কাছে বাড়ির বউ হয়ে থাকেননি, থেকেছেন তাঁদের সন্তান হয়ে। পিতামাতার অভাব বুঝতে দেননি। তাঁর শৈশবের সঙ্গী ছিলেন খোকা। ছোটোবেলা থেকেই দুজনে একই পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, বড়ো হন। এমনকি একই পরিবারে। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য দুটো নাম। শৈশব-কৈশোর কেটেছে টুঙ্গিপাড়ার প্রকৃতির কোলে; পাখি ডাকা, গাছগাছালি ঘেরা মধুমতী নদীর তীরে। স্বাভাবিকভাবেই রেণু তাঁর কিশোরী বয়স থেকে খোকার আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সহজাত মানসিকতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতাসহ সাহস ও আত্মবিশ্বাসী সত্তা দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন।

শিশু বয়সে বিয়ে হলেও রেণুর সংসার শুরু হয় ১০ বছর বয়সে ১৯৪২ সালে আর খোকার ১৯ বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাসের পর। রেণুর লেখাপড়া পরিবার এবং গোপালগঞ্জ মিশনারিতে শুরু হলেও বেশি দূর এগোয়নি। ঘরেই লেখাপড়া শিখেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের শিক্ষা ছাড়াই তিনি হয়ে ওঠেন সুপ্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল। জীবন সংগ্রামের সব কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে তিনি পরিবারও সামলিয়েছেন বেশ গুছিয়ে। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'– এর জলন্ত প্রতীক তিনি। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন যোগ্য বিশ্বস্ত সহচর এবং ছায়াসঙ্গিনী। বঙ্গবন্ধু বাড়িতে খুব অল্প সময় থেকেছেন। কিন্তু যে সময়টুকু থেকেছেন, সেটুকু সময় সুরভির ফুলের রেণু হয়ে সোনার আলোয় ভুবন ভরিয়ে দিতেন তিনি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে তিনি প্রশ্নহীনভাবে সমর্থন দিয়েছেন, মনোবল ও সাহস জুগিয়েছেন, অপরিসীম প্রেরণা দিয়েছেন। এই দম্পতির দুই কন্যা ও তিন পুত্র সন্তান। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কন্যা শেখ হাসিনা, ১৯৪৯ সালে পুত্র শেখ কামাল, ১৯৫৩ সালে শেখ জামাল, ১৯৫৭ সালে কন্যা শেখ রেহানা এবং ১৯৬৪ সালে পুত্র রাসেল জন্মগ্রহণ করেন।

বেগম ফজিলাতুন নেছার পিতামহ শেখ মো. আবুল কাশেম তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বেগম ফজিলাতুন নেছা ও তাঁর বোনকে দান করে দেন। দাদার দিয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যে অর্থ আসত, তা অহেতুক খরচ না করে তিনি জমিয়ে রাখতেন; ছোটোবেলা থেকেই তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন। নিজের সাধ-আহ্লাদ পূরণে তা খরচ না করে সংগঠন পরিচালনার কাজে তাঁর জমানো টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিতেন। রাজনীতি করতে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তা তিনি বুঝতেন এবং স্বামীর পথচলাকে সহজ করতেই ছিল তাঁর এই প্রয়াস। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* লেখায় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'সত্যি বলতে রেণুই ছিল আমার ব্যাংক। সে তাঁর বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যতটুকু টাকা-পয়সা পেত, সেসব আমার খরচের জন্য জমিয়ে রাখত।' ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে কারাগারে থাকাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইটি লেখেন। বইটি লিখতে প্রেরণা ও উৎসাহ দেন তাঁর স্ত্রী রেণু।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কলকাতায় লেখাপড়া ও রাজনীতি করতেন, দফায় দফায় কারাবরণ করেছেন। এই নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না তাঁর। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ টুঙ্গিপাড়া থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকায় এসে রজনী বোস লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। ১৫ই মে বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়ন, বন ও সমবায়মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৩০শে মে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা বাতিল করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রীর চেয়ে দলের দায়িত্বকে প্রাধান্য দিয়ে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দল গোছাতে মনোযোগ দিলেন বঙ্গবন্ধু। এই নিয়ে কোনো অনুযোগ ছিল না বঙ্গমাতার। হাসিমুখে স্বামীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সংসদ ভেঙে দেয় এবং রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। ১১ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় রেণুর জীবনে আরেক কষ্টের অধ্যায়। স্বামী কারাগারে, কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইল না। তিন দিনের নোটিশে সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছাড়তে হলেও তিনি অটল থেকেছেন হিমালয়ের মতো। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, লড়াই, সংগ্রামে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, কিন্তু তিনি কখনও ভেঙে পড়েননি। যত কষ্টই হোক তিনি কখনই বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতি ছাড়তে বলেননি। বরং সমর্থন করে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা করেন। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে ছয় দফার সমর্থনে জনসভা করে ঘরে ফেরার পর গভীর রাতে গ্রেপ্তার হন। ছয় দফা থেকে একচুলও নড়া যাবে না– বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ বাস্তবায়নে বঙ্গমাতা ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন।

১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি নৌ ও সেনাবাহিনীর সদস্য এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। ১৭ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে পূর্ববর্তী একটি মামলায় খালাস দেওয়া হয়। ১৮ই জানুয়ারি জেলগেট থেকে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রেণু সেদিন বিচলিত না হয়ে আইনিভাবে মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আইনজীবীদের পরামর্শসহ অর্থ জোগানোর নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা বেগম ফজিলাতুন নেছাকেও গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়। লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান সরকার। প্যারোলে মুক্তির সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেন রেণু; প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে জোরালো আপত্তি জানান। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্যারোলে মুক্তি না নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত যে-কোনো মাপকাঠিতে অনন্য হিসেবে স্বীকৃত।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সোনালি সময়ের চৌদ্দ বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ছিলেন। এ সময়ে রেণু দক্ষ হাতে সামলিয়েছেন ছেলেমেয়ে, সংসার। পাশাপাশি আইনজীবী নিয়োগ, মামলা চালানোর খরচ, কোর্টে যাওয়া, রান্না করে স্বামীর জন্য কারাগারে নিয়ে যাওয়াসহ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তা কার্যকর করতেন। বঙ্গবন্ধু যে পদক্ষেপ নিতেন সেটাকেই সমর্থন করতেন তিনি। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, আন্দোলন চলাকালীন প্রতিটি ঘটনা জেলখানায় সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ নিয়ে আসতেন। বঙ্গবন্ধুর মামলা পরিচালনা এবং সংসার চালাতে গিয়ে তিনি নিজের গহনা ও বাসার ফ্রিজ বিক্রি করতেও দ্বিধা করেননি। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের কথা ভাবেননি। খোকা থেকে মুজিব, মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু এবং সবশেষে বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য; তিনি আমাদের নারী জাতির অহংকার। ধূপের মতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে মুক্তি ও আত্মবিশ্বাসের শুভ্রতায় সুঘ্রাণ ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে হিমালয়সম আসনে অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছেন। তখন তিনি সন্তানদের প্রতিপালন ও লেখাপড়া করানোর সব কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করে নিজের জমানো অর্থ ও আবাসন ঋণ নিয়ে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডে বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ, সাহস আর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন আমৃত্যু। কোনো পদ-পদবির অধিকারী না হয়েও বঙ্গমাতা ছিলেন নারীর ক্ষমতায়নের এক অনন্য প্রতীক। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি একজন সাহসী নারী। অসাধারণ বুদ্ধি, দুর্বার সাহস, সর্বংসহা আর দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন তিনি। মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে না উঠলেও, একজন সহধর্মিণী হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছেন; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও লক্ষ্য পূরণে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল অবিচল। ছিলেন তাঁর জীবন-মরণের সঙ্গী হয়ে। রেণু এমন একজন নারী যিনি তাঁর জীবনসঙ্গী পুরুষটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন অর্ধেক বা আংশিক হয়ে নয়; সম্পূর্ণ একজন নারী হয়েই। বঙ্গবন্ধু-পরিবারের ঘনিষ্ঠজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং গবেষক ড. নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর লেখা *বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব* বইটিতে লিখেছেন, "দৈহিক ও মানসিক সব কিছু নিয়েই বঙ্গবন্ধু ছিলেন আনন্দময় পুরুষ। আর এই আনন্দের উৎস তো ঘরের ভেতর ঘোমটার আড়ালে। গভীর আস্থা ছিল বঙ্গবন্ধুর রেণুর প্রতি। সংস্কৃত পণ্ডিতরা যাকে বলেছেন 'সখা, সচিব'– 'রেণু' ছিলেন তাই।" তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতার বাণী যেন তাঁদের দুজনের জীবনে চিরসত্য–

> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সম্পর্কে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'তিনি (শেখ ফজিলাতুন নেছা) আমাদের সময়ের খনা, এই সময়ের বেগম রোকেয়া, এই সময়ের চন্দ্রাবতী। তিনি ইতিহাসের মানুষ।' এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, মানবিকতা, মমত্ববোধ আর ভালোবাসা দিয়ে রচনা করেছিলেন ইতিহাসের এক মহাযজ্ঞ।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামাল ছিলেন রণক্ষেত্রে। কারাবন্দি শেখ মুজিব ছিলেন

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কায়। তবু তিনি হতাশ হননি। বরং সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ তিনি। সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রেরণার সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিলেন বেগম মুজিব।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে নিকষ কালো অধ্যায়। সেদিন লেকপাড়ের পাখিরা যখন ডাকাডাকি শুরু করেছিল, মসজিদে মসজিদে আজানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছিল তখন দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নিষ্ঠুরভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তিনিও নিহত হন। কলঙ্কিত হলো বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর আজীবন সুখে-দুঃখে, সংকটে, সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী, ছায়াসঙ্গী, সহযোদ্ধা, সকল অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন; মৃত্যুকালেও তাঁর সহযাত্রী হয়ে রইলেন। খুনিরা খুনের নেশায় বিভোর। সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তিনি খুনিদের কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা চাননি। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে বীরের মতো বুক পেতে দেন বুলেটের সামনে। জীবনের মতো মরণেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী হলেন এই মহাপ্রাণ নারী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অনুপ্রেরণাদায়িনী হয়ে পাশে ছিলেন। যে সম্মান আর ভালোবাসায় দুজন দুজনের প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিলেন, ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, মৃত্যুকেও তাঁরা বরণ করে নিলেন একইসঙ্গে।

রেণু বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারীর অনন্য উদাহরণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদান। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই 'বঙ্গমাতা' উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। তিনি মানবসেবা ও কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর মধ্যে কোনো অহংবোধ ছিল না। বিলাসী জীবন কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা অবিচ্ছিন্ন সত্তা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কোনো এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমার জীবনে দুটো বৃহৎ অবলম্বন আছে– একটি আমার আত্মবিশ্বাস, অপরটি (একটু থেমে) 'অপরটি আমার স্ত্রী, আমার আকৈশোর গৃহিণী'।" তিনি বঙ্গবন্ধুকে শক্তি, সাহস, মনোবল, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বলেই শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছেন, 'জাতির পিতা' হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু জীবনে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন, সবটাতেই তিনি তাঁকে ছায়ার মতো সাহায্য করেছেন। ড. নীলিমা ইব্রাহিমের মন্তব্যই এখানে যথার্থ। তিনি বলেছেন, 'রেণু ছিলেন নেতা মুজিবের Friend, Philosopher and Guide. বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে ছায়ার মতো অনুসরণ করে তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অফুরান প্রেরণার উৎস হয়েছিলেন বেগম মুজিব।'

'বিশ্বে যা কিছু চির সুন্দর, কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনী বিশ্লেষণে বিদ্রোহী কবির এই কবিতার যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার দীপ্ত অধিকার; সে ভাষণের ক্ষেত্রেও রয়েছে বঙ্গমাতার বুদ্ধিমত্তার ছাপ। ৭ই মার্চ ভাষণের আগে নানাজনের নানা পরামর্শ আসতে লাগল বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধুর প্রধান উদ্দীপক ও পরামর্শক হিসেবে স্ত্রী রেণু স্বামীকে বললেন, 'অনেকেই অনেক কথা বলবে। তুমি সারা জীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছ, তুমি জেল খেটেছ। তুমি জান, কী বলতে হবে! তোমার মনে যে কথা আসবে, সে কথাই বলবা।'

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনিও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭২ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও আত্মত্যাগী নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। সে সব কাজে বঙ্গমাতার ভূমিকা ছিল অপরিসীম ও অসাধারণ। স্বাধীনতার পর বীরাঙ্গনাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মা। বীরাঙ্গনা রমণীদের জন্য জাতি গর্বিত। তাঁদের লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। কেননা তাঁরাই প্রথম প্রমাণ করেছেন, কেবল বাংলাদেশের ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও আত্মমর্যাদাবোধে কী অসম্ভব বলীয়ান।' ভারত, জাপান, ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন ও জার্মানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক্তার এনে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাঁদের চিকিৎসাসহ সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করেন। তিনি অনেকের বিয়ের ব্যবস্থা করে তাঁদেরকে সামাজিক মর্যাদায় আলোকিত জীবন দিয়েছেন। এমনকি এ সব বিয়েতে তিনি নিজের গহনাও খুলে দিয়েছেন। অথচ তাঁর দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়েতে দামি অলংকারের পরিবর্তে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছেন পুত্রবধূদ্বয়কে। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্তানদেরকেও তিনি একই আদর্শে গড়ে তুলেছেন; জাতিকে উপহার দিয়েছেন বিশ্বমানের রাজনীতিবিদ হিসেবে কন্যা শেখ হাসিনাকে।

বঙ্গবন্ধু চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় আর রেণু ঢাকায় বনানী কবরস্থানে। এ মহীয়সী নারীর জন্ম ও মৃত্যু হয় একই মাসে। তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মে-আদর্শে, শক্তি এবং মমতাময়ীরূপে বাংলার ঘরে ঘরে।

কামরুন নাহার মুকুল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফিচার-রাইটার ও নাট্যকার

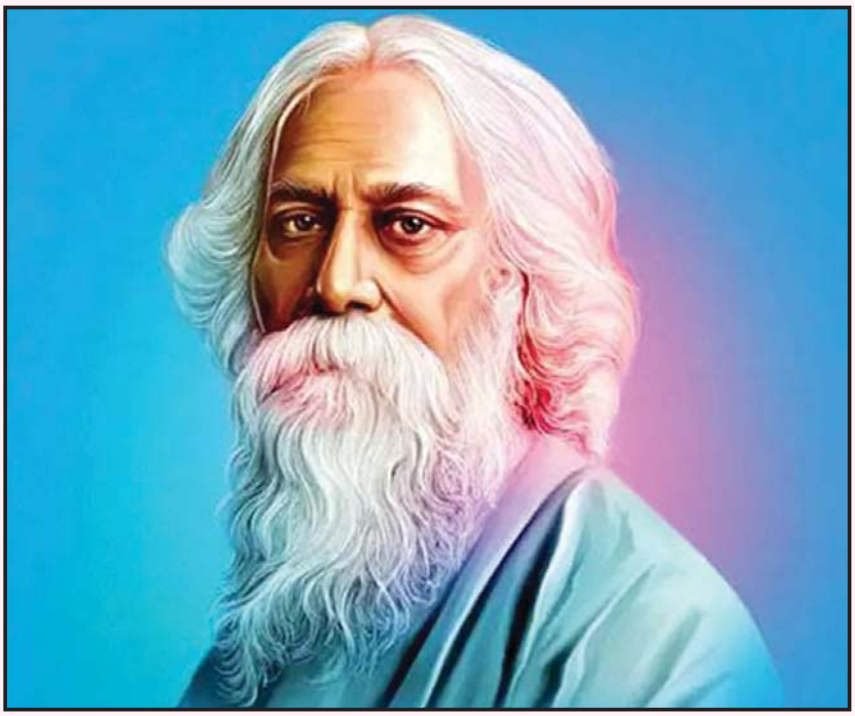

রবীন্দ্র-গানে ফুল

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে।
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে।

রবীন্দ্রনাথ আপাদমস্তক প্রকৃতিপ্রেমী কবি। অধিকন্তু রোমান্টিক কবি। কবি কল্পনায় চাঁদ ফুল হয়ে ফোটে। তিনি প্রকৃতির আঁচলে জমিয়েছেন ঋতুভিত্তিক সমস্ত ফুল। "ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়।" ফুলের মৃদু বাতাস কি বার্তা বয়ে আনে, যার জন্য কবির প্রাণ ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ওঠে– 'কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায়-হায়।' রবীন্দ্র-কবিতা বিশেষ করে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় প্রতিটি ঋতুর ফুলগুলোকে কবিতায় এনেছেন নব নব অনুরাগের পরশ বুলিয়ে। প্রতিদিনের দেখায় এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমাদের তেমন করে ভাবায় না বা সেভাবে আমরা দেখি না বলেই সেগুলো থেকে যায় অনাদৃত। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টি সাধারণের অধিক বলেই তাদের দৃষ্টিতে প্রতিদিনের তুচ্ছ বিষয় হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী, আদৃত। যেমন– জীবনানন্দ দাশের 'চিল', 'শালিক', 'পেঁচা'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝিঙে ফুল'। জসীমউদ্‌দীনের 'লাল মোরগ', 'কচি লাউয়ের ডগা', 'হলদে পাখির ছা'। এমনই কিছু বুনো ফুল, লতা যাদের কদর হয়ত নেই ফুলদানিতে, সেসব কবির কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন- অতুলপ্রসাদ তাঁর বধূর জন্য যে মালিকা গেঁথেছেন, তা কোনো অভিজাত ফুলের বন্ধনে নয়। তাঁর কথায়: 'বঁধূ, ধরো ধরো মালা, পরো গলে/ফেলে দিও না বুনো কুসুম বলে।' কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বলেছেন, 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই'। কবিগুরুও বলেছেন,

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
... বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

বৈশাখে বকুল বাতাসের সাথে কানাকানি করে আর বনের অঞ্চলখানি পুলকে দুলে উঠে। তাই দেখে কবির মনে এক মধুর বেদনা জাগে। বৈশাখের ভোরের হাওয়া বয়ে আনে বকুলমালার গন্ধ। 'চাঁপাবনের কাঁপন', 'বনযূথীর সুবাস' কবিকে করে স্মৃতিকাতর। বর্ষায় সজল শ্যামল তমালকুঞ্জ পথে কবি দেখেছেন প্রকৃতির কমনীয় রূপ। বর্ষার অভিসারিকাদের কেতকীকেশরে কেশপাশ সুরভিত করতে বলেছেন। তারা কদম্বরেণু বিছায়ে দেবে শয়নে। কণ্ঠে নবগীত করবে রচনা মেঘমল্লার রাগে। 'কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া খেলে।' শুনেছেন শ্রাবণের গান–

শ্রাবণবরিষণ পার হয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে
গোপনে কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে
... কাহার নামখানি কয়ে কয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।

মানবমনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব এতটাই অনিবার্য যে, মানুষ তা কখনোই এড়াতে পারে না। আর পারে না বলেই প্রকৃতির পালাবদলের সাথে সাথে মানুষের হৃদয়-মনেও আসে পরিবর্তনের বাতাস। যেমন বর্ষার দিনে মিলিত সুখীজনের মনেও আসে অহেতুক বিচ্ছেদ-কান্না। কবির মনকেও বর্ষা করে ভারাক্রান্ত। 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,/...বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে। যূথীবনের গন্ধবাণীতে কবির পরান জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে।' কিছু পরেই কবিচিত্ত প্রশান্ত হয় মালতীর নিবেদনে। বর্ষার মালতী গুচ্ছ গুচ্ছ ফোটে। সুবাস না থাকলেও ঢলোঢলো মোহনীয়তা রয়েছে। গোলাপ, বেলী, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা নয়, কবি শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝিকে ডেকে বলেছেন,

অশ্রুভরা পুরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
... বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।

কদম ফুল ছাড়া বর্ষার দিনে কবি আর কিইবা নেবেন সাথে। 'কদম আর যূথী' ওরাই যে বর্ষার ফুল। বর্ষা হেসে অঞ্জলি ভরে দিয়ে যায়। যূথীবনের গন্ধে ভরা শ্রাবণের ধারা আজ বারে বারে কাকে যেন মনে করিয়ে দেয়। যে তাঁকে 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' করেছিল দান, সেই আজ চলে গেছে।

বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে–
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার।

তাই দ্বিধান্বিত কবি বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদান আপনারে। প্রিয়ার ব্যথা তাঁর বুকে বাজে দ্বিগুণ হয়ে। তাই কবির আক্ষেপ,

ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে।
বধূ, তোমায় বাঁধব কিসে মধুর বাঁধনে।

পুরো বর্ষায় কবি ছিলেন কদম কেতকী আর যূথীবনের শ্যামলছায়ে। যে ফিরে গেছে তারে আহ্বান করেন, 'যূথীমালা গলে এসো নীপবনে।' কবিচিত্ত আকুল হয়ে প্রকৃতির কাছে জানতে চায়, 'ফুল ফোটানোর খেলায় কেন ফুল ঝরানোর ছল।' পিয়ালতরুর কোলে যখন মালতীলতা দোলে, তখন কবির ভাবনা কোথায় হারায় যেন মেঘের মতন চলে কোনো নিরুদ্দেশ্যে।

শরতে প্রকৃতি আসে সৌম্য শুভ্র শান্ত বেশে। শারদলক্ষ্মীর আগমনে সাজানো হয়েছে নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে বরণ-ডালা। শেফালিমালা আর কাশের গুচ্ছ রয়েছে বরণ-ডালায়। শিউলি ঝরা উঠোনে দাঁড়িয়ে কবিপ্রাণ মোহিত। 'আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।' কবি ফুলের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। শরৎ-শশীর জোছনায় দেহ-মন পুলকিত, তাই রজনীগন্ধাকে বলেছেন, 'ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।' সম্পর্কের স্নেহ-ধারায় সিক্ত শ্বেত শতদল, পারুল দিদি , চাঁপা-ভায়ের সাথে চলে ছেলেখেলার ছল। শরত-আলোর কমলবনে সে যেন বিহার করে, যে ছিল তাঁর মনে মনে। শিউলিবনের উদাস বায়ু উদাস করে তাঁর মন। তাঁর কামনা, 'মালতীবিতানতলে বাজুক বধূর বাঁশি।' 'সারাবেলা শিউলিবনে আছি মগন আপন মনে', কারণ ললিত রাগের সুর ঝরে যে শিউলিতলে। মল্লিকাবনের প্রথম কলি দল মেলতেই কবি অঞ্জলি বেঁধে রেখেছেন। কুন্দ, মল্লিকা, মালতী, মাধবী, শিউলি, বকুল, কদম, কেতকী, কাশ, করবী সব যেন তাঁর পরমাত্মীয়। ভালোবাসার ধন। চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় ঝুমকোলতার চিকন পাতায় কাঁপন লাগে। পুলকিত চম্পার অভিনন্দন, মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন, পলাশের কুঙ্কুম, পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল দিয়ে বধূকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বকুলগন্ধে বন্যা এলো, চঞ্চলতা জাগিয়ে দিলো পলাশকলি, নবীন প্রাণের পত্র আসে, পলাশ-জবায়-কনকচাঁপায় অশোকে অশ্বত্থে। অশোক, কিংশুক, চামেলী ওরা আমাদের কাননে অযত্নেই বিকশিত হয়। পল্লবিত হয়। অথচ তাঁর মনে হয়েছে ওদের আমন্ত্রণেই ঋতুর আগমন। ওরাই সাজায় ডালা, ওরাই গাঁথে মালা। কবি ওদের কাছে আবেদন জানান–

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন
আকাশ নিবিড় করে তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে–

তিনি নিজের মতো করে একটু ফাগুন ভরে দিতে চান। এভাবে তিনি একেক সময় একেক ফুলের মালা গেঁথে বসে আছেন কাননবীথিছায়। প্রতীক্ষা সতত তারি, যে গেছে বিফল অভিসারে। যদি কখনো এসেই পড়ে তাইতো মল্লিকাবনের প্রথম ফোটা ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেবার মানসে তিনি তৈরি।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে।

কবির কাব্য কুসুমকাননে বনফুলের পাশে রয়েছে গোলাপসম্রাজ্ঞীও। তিনি প্রস্ফুটিত গোলাপের অনুপম সৌন্দর্য-পিয়াসী। তাই গোলাপের কাছে নিবেদন–

বল, গোলাপ, মোরে বল,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে

গোলাপের আঁখিমেলা অনুরাগের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ তৈরি।

ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধাহাস,
...তুই ফুটিবি, সখী, কবে।

রোমান্টিক কবি-মন কল্পনায় গড়ে এক অলৌকিক সৌন্দর্যের নন্দনকানন। ঋতুর হাওয়ায় পালাবদল ঘটে প্রকৃতির। প্রকৃতি কখনো রুক্ষ গিরিসন্ন্যাসী, কখনো নবধারাজলে সিঞ্চিত, কখনো ফুলের নিমন্ত্রণ নিয়ে আনে পুষ্পশোভাবিলাসী বসন্ত প্রকৃতি। শরতে স্নিগ্ধ সুরভিত শিউলি। শেফালির শাখায় বসে পাখি দম্পতির কুজন কলরব আনমনা করে কবিকে–

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়–
কোন কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো।

আদরে আবেগে শেফালির কাছে জানতে চান কবি–

ওলো শেফালি, ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।

প্রকৃতির অমোঘ মায়ায় রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেমী প্রাণ হয়ে ওঠে হিন্দোলিত পুলকে পলকে। বিস্ময়ে তাই জেগে ওঠে তাঁর প্রাণ। কেবল আনন্দ পরিমল পল্লবিত করে তা নয়, কখনো কখনো গভীর ব্যথা বিরহ দিনের গানের সুরে মগ্ন করে। তাই কবি বলেছেন,

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে।

এমনি আরেকটি গানে বলেছেন,

চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয়দোলার স্পন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুষ্পপ্রেম প্রগাঢ় বলেই সামান্য ঘাসের ডগায় ফোটা ঘাসফুল পেয়েছে অসামান্য ভালোবাসা। গোলাপ, জবা, পলাশ, অশোকের পাশে পেয়েছে সমান কদর। বনের ঘাসে ফোটা বনফুলকে সাদরে সম্বোধন করে বলেছেন,

ও মোর পথের সাথি পথে পথে গোপনে যায় আসে

যেন কৃষ্ণচূড়া , বকুল আর শিরীষ বনফুলের অভ্যর্থনায় সেজেছে। বনফুলের নেই জগৎসভায় আসন, ঘরেও নেই প্রণয় । কিন্তু কবির হৃদয়ে ওর জন্য অসীম দরদ। তাই শুধু নয়, পথের একপাশে আপন সৌন্দর্যে ফুটে থাকা ঘাসফুলের সাথে কবির 'প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।'

কবিগুরুর পুষ্পপ্রেম কেবল সুবাসে নয়, সৌন্দর্যে নয়, মূল্যে নয়, প্রকৃতির অকৃপণদানে ফোটা সকল পুষ্পই কবির নিশ্বাসে নিশ্বাসে গড়ে মিত্রতা। আর এ সম্পর্কে কবির নিজের ঘোষণা:

চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন-রাতের অন্ধকারে
চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে।

কবিগুরুর মালঞ্চ ভরে ওঠে ফুলে ফুলে। ফুলের সেই মেলায় রয়েছে পারুল, বকুল, কদম, কেতকী, মাধবী, মালতী, মল্লিকা, অশোক, কিংশুক, চামেলী, শিরীষ, শেফালি, গোলাপ, জবা, পলাশ, কুন্দ ছাড়াও অচেনা অনেক বনফুল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্বল্প সময়ে তাঁর কাব্য-অন্দরে বিচরণ অসম্ভব। কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে তার রূপ সৌন্দর্যে নয়ন-মন তৃপ্ত করার প্রয়াস মেটে মাত্র। প্রকৃতির মতো অবারিত রবীন্দ্র রচনাসম্ভারের সমগ্রকে একসাথে দুই চোখের সীমায় ধরতে চাওয়া যেন বিফল বাসনা। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, আকাশ, জল, বাতাস, ফুল, পাখি, তরুলতা, বৃক্ষ, নদী, ঋতুচক্র প্রভৃতি কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে অনিবার্যভাবে। তাই তাঁর গানে ও কবিতায় বার বার এসেছে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সকল অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতির প্রতি একটা নিবিড় আকর্ষণ বোধ করেছেন। খোলা আকাশের নীলের মায়ায় ডুব দিতে ছোট্ট রবি উঠে যেতেন তিনতলার খোলা ছাদে।

প্রেম-প্রকৃতি-পূজা-প্রার্থনা পর্যায়ের গানগুলো সব একইসূত্রে গাঁথা। কখনো ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, কখনো প্রকৃতির মায়ায় ও লীলায় আত্মসমর্পণ, কখনো কেবল মুগ্ধতা গানগুলোকে বিশ্বমানবের হৃদয়স্পর্শী করেছে। প্রেমের গানে এসেছে ঈশ্বর, মানুষ, প্রকৃতি, ফুল, পাখি, নারী। সব একাকার হয়ে একে লীন হয়ে যাওয়াতেই তাঁর গানের অসাধারণত্ব। তিনি তাঁর কবিতার মতো গানেরও বিষয়ের বৈচিত্র্য, ভাবের গভীরতা, বর্ণনার পারিপাট্য, ভাষার সৌকর্য দ্বারা এক অপার আনন্দলোক বিনির্মাণ করেছেন। সাধারণ ভাব ও ভাষা, প্রতিদিনের চেনা জগতের কতকিছুই কবির রচনার গুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। পুষ্পপ্রেমিক কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম মুগ্ধতায় বুনোফুলও হয়ে ওঠে পরম আদরের। কী হরষে কী বিষাদে প্রকৃতিই দিয়েছে শান্তির ছায়া। মানুষের জগতে যখন নানারূপ দ্বন্দ্ব, বেদনা, দুঃখ বিমর্ষ করে তুলেছে তখন কবির কাব্য-নন্দনকানন দিয়েছে বিমল শান্তি। সেখানে আছে ফুল, ফল, লতাপাতা, মৃদুগন্ধে ভরা বাতাস, ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, অশোক পলাশের রাঙা হাসি ইত্যাদি। কবির মালঞ্চ তাই ভরে ওঠে ফুলে ফুলে, প্রকৃতির দানে।

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী : কবি, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থপ্রণেতা ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, নওগাঁ

বাইগার পারের বাঙালি

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুণাবলির নাট্য-আখ্যান

শফিকুল ইসলাম

শিল্প-সাহিত্যে নাট্যশিল্প একটি শক্তিশালী ও প্রভাব সঞ্চারকারী ধারা। মঞ্চসফল কোনো নাটক দর্শকের মনোজগতে যে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম, তার প্রভাব সরাসরি। এ কারণেই জননন্দিত ও তেজোদীপ্ত কোনো চরিত্রকে যাবতীয় গৌরব ও মাহাত্ম্যসহ নাট্যকার যখন পুরাণ কিংবা ইতিহাসের পাতা থেকে এনে নাট্যশিল্পের আয়নায় উপস্থাপন করেন, সেই চরিত্র তখন এক ভিন্নতর মাত্রা অর্জন করে। শাজাহান, সিরাজউদ্দৌলা, মধুসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি এল রায় প্রমুখের হাত ধরে বাংলা নাটকে ইতিহাসও কথা বলতে শুরু করে। ইতিহাসের বিভিন্ন বীর চরিত্র যেন জাতীয় চেতনার দূত হয়ে ওঠে। শিবাজী, শাজাহান, সিরাজউদ্দৌল্লা এসব বাংলা নাটকের ধারারই প্রতিনিধিত্ব করে।

সংগত কারণেই বঙ্গবন্ধু শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখার অনুষঙ্গ। কবিতা, গান, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য শিল্প, চলচ্চিত্রসহ শিল্পের এমন কোনো মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা বঙ্গবন্ধুকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, নাট্যলেখ্য, অ্যানিমেশন, টিভি নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার কাজে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এককভাবে কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে এমন কর্মযজ্ঞ এক বিরল ঘটনাই বটে। বিশেষ করে নাট্যকার ও নাট্যকর্মীগণ বঙ্গবন্ধুকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্চে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা দেখিয়ে চলেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে বঙ্গবন্ধুকে অধিকতর প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনের কাজটি করেছেন মঞ্চনাটক নির্মাতারাই। এই মাধ্যমটিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলমান কর্মপ্রয়াসের ব্যাপ্তিও লক্ষ করার মতো। প্রাপ্ত তথ্য মতে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক মঞ্চনাটকের সংখ্যা ইতোমধ্যে অর্ধশত ছুঁয়েছে। এমনকি বহির্বিশ্বের কোনো কোনো দেশের মঞ্চ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের পঠন পাঠনেও বঙ্গবন্ধুকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

দেশের মঞ্চে বঙ্গবন্ধু চর্চার এমন নানামুখী আয়োজনের মাঝেই প্রান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শিশু-কিশোরদের নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলা নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক রহিম আব্দুর রহিম মঞ্চে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক *বাইগার পারের বাঙালি*। বাংলাদেশ এবং ভারতে ইতোমধ্যে শিশু থিয়েটার ধারার এই নাটকটির বেশ কিছু সফল মঞ্চায়ন হয়েছে এবং দর্শক নন্দিত হয়েছে।

নির্দেশকের মতে, 'বঙ্গবন্ধুকে সহজে শিশুদের মাঝে পরিচিত করতে এই নাটকই যথেষ্ট। নাটকটি পড়ুয়াদের পাঠসূচি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।' বঙ্গবন্ধুকে সহজ উপায়ে জানতে এবং চিনতে নাটকটির উপযোগিতা অপরিসীম।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর শৈশবে যে নদীটিতে মিলেমিশে একাকার, সেটির নাম 'বাইগার'। স্থানীয়জনের কাছে এটি 'বাঘিয়া'র বা 'বাগিয়া' নামেও পরিচিত। গোপালগঞ্জের বর্নি বাঁওড় থেকে উদ্ভূত হয়ে স্বচ্ছতোয়া বাইগার গোপালগঞ্জ বিল ছুঁয়ে বঙ্গবন্ধু সমাধি এলাকার পাশ দিয়ে ডুমুরিয়ার পথে প্রবাহিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বঙ্গবন্ধুর জীবনের যে-কোনো পর্বকে কেন্দ্র করেই সফল নাটক বা চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে। *বাইগার পারের বাঙালি* নাটকটির ক্ষেত্রে নাট্যকার রহিম আব্দুর রহিম সে পথেই হেঁটেছেন। নিজে নিবেদিত রয়েছেন শিশু-কিশোর থিয়েটার নিয়ে। শিশু-কিশোরদের থিয়েটারে যুক্ত করা এবং থিয়েটার কর্মী রূপে গড়ে তোলার কাজটিকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। *বাইগার পারের বাঙালি* নাটকে কিশোর মুজিব কীভাবে জাতীয় রাজনীতির এক অনিবার্য চরিত্র হয়ে উঠলেন, নাট্যকার এই দিকটিকেই বেছে নিয়েছেন। অনন্য মানবিক গুণাবলি ও নেতৃত্বগুণের সমন্বয়ে এক দুরন্ত খোকার

মাঝে কীভাবে বিশ্বনন্দিত একজন মুজিব তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটি সচল হয়েছিল, নাটকটিতে সে দিকটিতেই আলো ফেলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

বাইগার পারের বাঙালি নাটকটির আঙ্গিক ও ঘটনা বিন্যাসে বাংলা মঞ্চনাটকের প্রচলিত ধারাটিই অনুসৃত হয়েছে। মোট পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকের দৃশ্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫,৫,৪ এবং ১টি। তবে একটি প্রারম্ভিকার দৃশ্যে নাটকের দর্শকগণকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু পরিবারে সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের দুঃসহ স্মৃতিকেও ছুঁয়ে যেতে হয়। হৃদয়বিদারক ও বিষণ্নতা সৃষ্টিকারী পঁচাত্তরের রেশ মাথায় রেখেই *বাইগার পারের বাঙালি* নাটকের দর্শক তাদের মুজিব দর্শন শুরু করেন। এতে ট্যাজিডির নায়ক মুজিবের ছায়াটিও নাটকের শুরু থেকেই দর্শকের সঙ্গী হয়ে যায়।

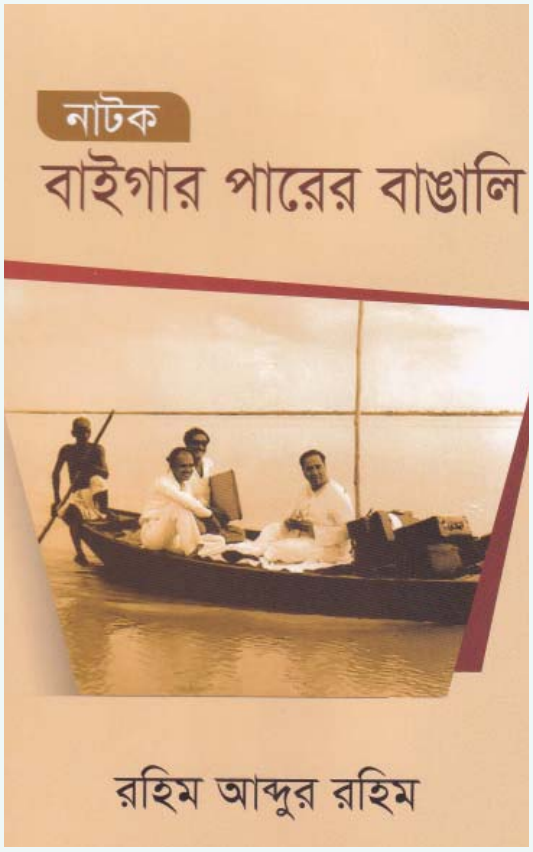

এই নাটকের প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে দর্শক প্রত্যক্ষ করেন, *বাইগার নদীর পারে* প্রতিনিয়ত নানা দুরন্তপনা আর দুঃসাহসিক কাজের মধ্য দিয়ে খোকা নামে যে ছেলেটি বেড়ে উঠছে, তার ধাঁচ, বলন, চলন, চিন্তা– সব কিছুই অন্য দশজন থেকে আলাদা। বিশেষ করে সহজাত এক নেতৃত্বগুণ তাকে যেন অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে দেখতে বাধ্য করে। দুরন্ত কিন্তু মানবিকতায় উজ্জ্বল এই খোকা অসুস্থ শিক্ষকের জন্যে ওষুধ আনার প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় সাঁতরে নদী পারাপার করতে পারে। মুহূর্তেই এগিয়ে যেতে পারে মানুষের যে-কোনো বিপদে। বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রাপালা *নীলকর* দেখে অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ঘটনা থেকে খুঁজে নিতে পারে নিজের চেতনাকে শাণিত করার উপাদান। শুধু তাই নয়, কিশোর মুজিবের উচ্চ নৈতিকতার বিষয়টিও নাটকের এই অংশে উঠে এসেছে চমৎকারভাবেই। স্থানীয় দুই দলে ফুটবল খেলা হবে। একটি দল মুজিবের, অন্য দলটি মুজিবের বাবা শেখ লুৎফর রহমানের। বন্ধুদের পরামর্শ বাবার দলকে একটু ছাড় দেওয়া হোক। কিন্তু মুজিব তো অন্য ধাঁচে গড়া। তার সাফ কথা, খেলার মাঠ একটা যুদ্ধের ময়দান, এখানে আপোশ করলে আসল যুদ্ধেও সে হেরে যাবে।

বাইগার পারের বাঙালি নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য পরম্পরায় দর্শকের সামনে যে মুজিবের উপস্থিতি, তিনি সতেরো-আঠারো বছরের এক যুবক। তবে চিন্তায় অধিকতর পরিণত। দেশজুড়ে আকাল, রাজনীতিতে নানামুখী টানাপড়েন কিন্তু মুজিব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে গভীর অনুধ্যান এবং রাজনীতির মাঠে ন্যায়সংগত অবস্থানের মাধ্যমে মুজিব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণের আস্থার মানুষে পরিণত হন।

ঘটনাপ্রবাহ তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছালে আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষ ভেঙে ইতোমধ্যে দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ততদিনে মুজিবের সঙ্গে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তেমনই স্থানীয় রাজনীতিতেও তৈরি হয়েছে শক্ত ভিত্তি। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, এ সত্যটি দিন দিন প্রকট হতে থাকে। চারপাশ জুড়ে যেন মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই বেজে চলে। মুজিব উপলব্ধি করেন বাংলার মানুষের সত্যিকারের মুক্তি আনতে হলে লড়াই সংগ্রামকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। কঠিন এই পথে নেতৃত্বের ভার তুলে নিতে হবে তাঁকেই।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখতে পাই, পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছেন। ভাষা আন্দোলনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন অসীম সাহসিকতায়। রুখে দাঁড়িয়েছেন সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুজিবের বিরামহীন সংগ্রামেরই ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

নাটকের সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা সাকুল্যে একটাই। এই অংশটিতে মূলত বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং নানা ধাপ অতিক্রম করে একাত্তরের বন্দরে পা রাখার যে সংগ্রামী অভিযাত্রা, সে বিষয়গুলোকে এক নাটকীয় আবহের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দেখা যায়, বাইগার পারের এক দুরন্ত কিশোর খোকার মধ্যে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া, তা ভিত্তি করেই বক্ষ্যমাণ নাটকটির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। সাধারণত ইতিহাসনন্দিত ব্যক্তিত্বের জীবনের ছায়াকে ঘিরে নির্মিত নাটকে দেশপ্রেম এবং জাতীয় চেতনার বিষয়টি অনিবার্যভাবেই সামনে এসে পড়ে। সেদিক থেকে বলা যায় যে, ব্যক্তি মুজিবের জীবন প্রবাহের কিছু টুকরো ঘটনার উপর আলো ফেলাই এই নাটকের মূল লক্ষ্য নয়। বরং

সময়ের নানা ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে দর্শক-পাঠক যেন পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত বাংলা ও বাঙালির চির আপন মুজিবের ছবিটি চিনে নিতে পারে, সেই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়াও নাটকটির অন্যতম বিবেচ্য।

নাট্যশিল্পের প্রাণ মঞ্চ। সংলাপ, অভিনয়শৈলী এবং প্রয়োজনীয় নাটকীয় আবহের মধ্য দিয়ে নাটক দর্শকের চৈতন্যলোকে এমন এক ঝড়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা তাকে সত্যের মুখোমুখি হতে বাধ্য করে, তার চিন্তা ও মননে সৃষ্টি করে ইতিবাচক প্রণোদনা। *বাইগার পারের বাঙালি* নাটকটি এক্ষেত্রে সফল নাটক বলা যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে দেখা যায়, বিরুদ্ধ পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠার মাধ্যমেই নাট্যশিল্পের অন্তর্গত শক্তির জোরালো প্রকাশ ঘটেছে। দর্শক মনে এর আবেদনও হয়েছে তীব্র। জন জাগরণে যোগ হয়েছে নতুনতর মাত্রা। বর্তমান নাটকটির আখ্যান এবং উপস্থাপনার সঙ্গে অভীষ্ট দর্শকদের একাত্মতাবোধের মাত্রাটিই হয়ে ওঠে প্রধান বিবেচ্য।

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পটভূমিটি দর্শক মনে গেঁথে দেওয়ার ক্ষেত্রে *বাইগার পারের বাঙালি* নিঃসন্দেহে সাফল্যের দাবি রাখে। তবে শত বিরুদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ জয় করে গণমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু চরিত্রের নিত্যকার টানাপড়েন যেন নাটকটিতে ততটা তীব্র নয়। ফলে যে আখ্যান মূলত একটি বক্ররেখা সদৃশ, তা যেন অনেকটা সরল রেখার রূপ পেয়েছে। হয়ত শিশু-কিশোর নাটক বিবেচনায় সচেতনভাবেই নাট্যকার এই পথ অনুসরণ করেছেন।

যে-কোনো নাটকের দর্শকগণের তন্ত্রীকে নাড়া দিতে এবং নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে গতিমান রাখতে সংলাপ এবং চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মুজিবকে ঘিরে যে সকল চরিত্রের অবতারণা হয়েছে, সেগুলোও মুজিব চরিত্র বিকাশে কার্যকর অবদান রেখেছে। তবে কিছু কিছু সংলাপকে ভাষণধর্মী, আরোপিত এবং চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এটি পরিহার করা গেলে নাটকটির সংলাপ আরও শানিত হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল বলেই মনে হয়।

স্বীকার্য যে, *বাইগার পারের বাঙালি* নতুন প্রজন্মের বঙ্গবন্ধু অনুধ্যানের ক্ষেত্রে একটি আন্তরিক সংযোজন। প্রথাগত পঠন-পাঠনের গণ্ডি ছেড়ে শিশু-কিশোররা এ জাতীয় নাটক বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যত বেশি সম্পৃক্ত হতে পারবে, দেশ এবং তার সংগ্রামী ইতিহাস তাদের মনস্তত্ত্বে তত ইতিবাচকভাবে রেখাপাত করবে।

শফিকুল ইসলাম : প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্রনাথ গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও শিক্ষাবিদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ভজনপুর ডিগ্রি কলেজ, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

নিবন্ধ

নজরুলের ধূমকেতু অমৃত সম্পদ

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে এক অমৃত সম্পদ। নজরুলের সম্পাদনায় *ধূমকেতু* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি *ধূমকেতু* পত্রিকায় পরাক্রমশালী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণমানুষের কথা বলেছেন। তাই তো পরাধীন ভারতবর্ষের আপামর জনতার মুক্তির স্বপ্ন ফুটে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় নজরুলের *ধূমকেতু* এক অবিস্মরণীয় নাম।

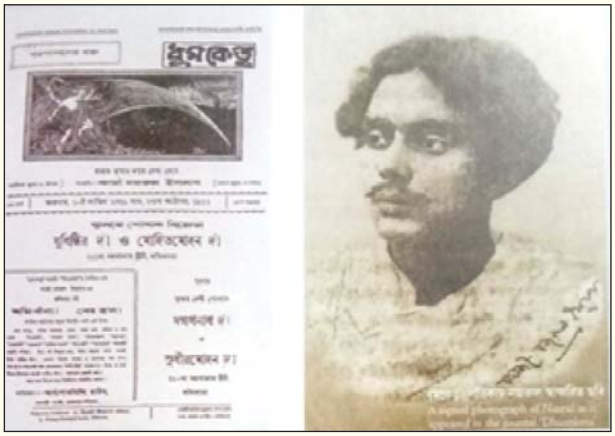

নজরুল ও *ধূমকেতুর* আত্মিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, তিনি স্বাধীনতাকামীদের কবি।

ধূমকেতু প্রথম প্রকাশ হয় ২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১১ই আগস্ট ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার। এই পত্রিকাটি নজরুল সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। নজরুল *ধূমকেতু* পত্রিকার উদ্যোক্তা এবং মালিক। *ধূমকেতু* পত্রিকায় বাংলা ভাষায় নজরুলই প্রথমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন। *ধূমকেতু* পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার করে বের হয়। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /. আনা এবং বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। ক্রাউন ১৫″ X ২০″ পৃষ্ঠার মাপে প্রথম ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা বের হয়। কাগজ সাধারণ নিউজ প্রিন্ট। প্রথম পৃষ্ঠার কাগজের ওপর দিকে সৌরমণ্ডলের ছবি। ধূমকেতু আঁকা থাকে। *ধূমকেতু* পত্রিকাটি পুরো কালো কালিতে ছাপা হতো। ছাপা হয়েছিল মেটকাফ প্রেসে। যার ঠিকানা ৭৯ বলরাম দে স্ট্রিট, কলিকাতা। ৩২ নং কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে আফজালুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

ধূমকেতু প্রকাশের নেপথ্যের কিছু কথা– এই পত্রিকাটি প্রকাশের একটি আকস্মিক ঘটনা বললে ভুল হয় না। মুজফ্‌ফর আহমদ জানিয়েছেন, পল্টন থেকে ফিরে নজরুল রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তাঁরা দুজন স্থির করেছিলেন একটি দৈনিক পত্রিকা বের করবেন। যেটার ভেতর দিয়ে তাঁদের মত ও পথ নিরূপিত হয়ে যাবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা 'নবযুগ' বের করার উদ্যোগী হয়েছিলেন। আসলে পল্টনে বাসকালে 'রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব ও লালফৌজের লড়াই নজরুলের ইসলামের মনে সাড়া জাগিয়েছিল'। *নবযুগ* বা *সেবক* কোনো পত্রিকাতেই তিনি স্বাধীনভাবে, মুক্তকণ্ঠে তাঁর কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এমনি সময়ে আকস্মিকভাবে সুযোগ এসে গেল। মসউদ আহমেদ নামে জনৈক ব্যক্তি (মুজফ্‌ফর আহমদের পূর্বপরিচিত) মুজফ্‌ফর আহমদের কাছে একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্যে তিনি মাত্র আড়াইশো টাকা দিতে চাইলে মুজফ্‌ফর আহমদ তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন–

> আমি তাঁর প্রস্তাব নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা নজরুল ইসলামের নিকটে চলে গেল এবং একই প্রস্তাব তাঁর নিকটেও করল। 'সেবক'-এ নজরুল সুখি ছিল না। কাজেই মসউদ আহমেদের প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। একমাত্র নজরুলের পক্ষেই এমন হঠকারী এবং দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব, এ কথা বলা বাহুল্য। তবে এই আপাতত হঠকারিতা বা দুঃসাহসিকতা, যা-ই বলি না কেন, তার পেছনে হয়তো তাঁর স্বাধীনভাবে পত্রিকা প্রকাশের গোপন প্রবল ইচ্ছা কাজ করেছিল। যাই হোক, সামান্য টাকা সম্বল করে নজরুল অসামান্য উৎসাহে পত্রিকা প্রকাশে অবতীর্ণ হন, পত্রিকার নাম নিজেই স্থির করেন। শুধু তাই নয়, মসউদ আহমেদ চেয়েছিলেন সাপ্তাহিক বের করতে, নজরুল সেই টাকা দিয়ে অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন।[১]

ধূমকেতু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি ছাপা হতো। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণীটি প্রথম সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত লেটারে ছাপা হয়। সপ্তম থেকে ত্রিশ সংখ্যা পর্যন্ত হস্তাক্ষরে ছাপা হয়। আবার বত্রিশ সংখ্যা লেটারে ছাপা হয়। উল্লেখ্য নজরুল ইন্সটিটিউট ৩২টির মধ্যে ২৭টি সম্মানিত হবীবুল্লাহ্ বাহার জামানের তনয়া সেলিনা বাহার জামানের মাধ্যমে পেয়েছে। সাতাশটি একত্রিত করে প্রকাশ করেছে। ২১, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ৩১ সংখ্যাগুলো এখনও উদ্ধার হয়নি। সুতরাং উদ্ধার না হওয়া সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি লেটারে ছাপা না হস্তাক্ষরে ছাপা এটা বলা সম্ভব নয়। আশীর্বাণীটি–
কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

> আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
> আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
> দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
> অলক্ষণের তিলক রেখা,
> রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
> জাগিয়ে দে রে চমক্ মেরে'
> আছে যারা অর্দ্ধচেতন!
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪ শ্রাবণ, ১৩২৯

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটিতে লেটারে ছাপায় ষষ্ঠ লাইনে অর্থাৎ 'অলক্ষণের তিলক রেখা,' এর শেষে 'রেখা' শব্দটির পরে কমা আছে। কিন্তু হস্তাক্ষরে ছাপায় 'রেখা' শব্দটির পরে কমা নেই। আবার লেটারে ছাপায় সপ্তম লাইনে অর্থাৎ 'দে রে' আলাদা করে আছে। কিন্তু হস্তাক্ষরে ছাপায় 'দেরে' শব্দটি একসাথে আছে। *ধূমকেতু* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাণী

পাওয়ার কাহিনি প্রকাশ করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আর তা বর্ণনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–

> "...তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখান করেছেন। তা ছাড়া, এ-নজরুল, যাঁর কবিতায় পেয়েছেন তিনি 'তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা'। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন 'ধূমকেতু'-র মর্মকথা কি! ..." প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, 'বিশ্বকবি তখনও নজরুলকে ভালো করে চেনেননি, কিন্তু তাঁর (নজরুল) যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতেই আশীর্বাণী লিখে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তিনি যে কর্তব্যের কথা লিখেছেন, নজরুল তা সার্থক করে তুলবেন।[২]

কাজী নজরুল ইসলামের সাহসী উচ্চারণের ব্যাপক ভূমিকা ধূমকেতু পত্রিকায় পাওয়া যায়। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে নজরুল ছিলেন এক ত্রাস। নজরুলের এই সাহসকে ইংরেজ সরকার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ধূমকেতুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় লেখাগুলো গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে। নজরুলের যে সমস্ত কবিতা ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (২১, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ৩১ সংখ্যাগুলো এখনও উদ্ধার হয়নি। সুতরাং এই সংখ্যাগুলোতে নজরুলের কোনো কবিতা ছিল কি না জানা নেই–

১. ধূমকেতু-প্রথম সংখ্যা (১১ই আগস্ট, ১৯২২)
২. বিদ্রোহী-প্রথম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত
৩. ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত-প্রথম সংখ্যা
৪. জাগরণী-দ্বিতীয় সংখ্যা (১৫ই আগস্ট, ১৯২২)
৫. রক্তাম্বর-ধারিণী মা-৪র্থ সংখ্যা (২২শে আগস্ট, ১৯২২)
৬. মোহররম-মোহররম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত-সপ্তম সংখ্যা (১৩৪১ হিজরি)
৭. কামাল পাশা-অষ্টম সংখ্যায় (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২)
৮. আনন্দময়ীর আগমনে-দ্বাদশ সংখ্যা (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)
৯. আগমনী-দ্বাদশ সংখ্যা (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)
১০. রণ-ভেরী-ষষ্ঠদশ সংখ্যা (২৪শে অক্টোবর, ১৯২২)
১১. দুঃশাসনের রক্ত-১৭শ সংখ্যা (২৭শে অক্টোবর, ১৯২২)[৩]

নজরুল রচিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি ধূমকেতু পত্রিকার ১২নং সংখ্যায় অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এটা একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কবিতা। এই কবিতা লেখা এবং ছাপার জন্য পুলিশ ধূমকেতু কার্যালয়ে হানা দেয় ৮ই নভেম্বর ১৯২২। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় নজরুল রূপক অর্থে ঔপনিবেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কবিতাটি প্রকাশ হওয়ার পর ইংরেজ শাসক সেটা বুঝতে পারায় নজরুল রাজরোষে পতিত হন।

ধূমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় নজরুল ২৩শে নভেম্বর ১৯২২ কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। নজরুল গ্রেপ্তার হওয়ার পরে রাজদ্রোহী বলে বিচারে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কবি কারারুদ্ধ হওয়ার পর অমরেশ কাঞ্জিলাল ধূমকেতু বের করেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ধূমকেতু পত্রিকায় বাংলা ভাষায় নজরুলই প্রথমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন। 'ধূমকেতু'র ১৩ নং সংখ্যা ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় নজরুলের 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নজরুল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই যে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট করে দেন। এই প্রবন্ধে নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন–

> সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। ... ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।[৪]

ধূমকেতুর ৩২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বয়স হয়েছিল ৫ মাস ১৬ দিন। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩ই মাঘ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জানুয়ারি ১৯২৩। এই শেষ সংখ্যায় নজরুলের জেল জীবনে রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধটি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি রবিবার দুপুর বেলা রচনা করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নজরুলের দেওয়া 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে ঔপনিবেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে ছিল এক সাহসী উচ্চারণ। এই জবানবন্দিতে নজরুলের জীবনদর্শন, আত্মচেতনা এবং আত্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে। নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে বলেন–

> আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীন হ'ত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থে নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।[৬]

ধূমকেতুর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে বলেন–

> ... জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'র বান্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্ত ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ... শুনেছি স্বদেশী যুগের 'সন্ধ্যাতে' ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ। একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করার মতো সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।[৭]

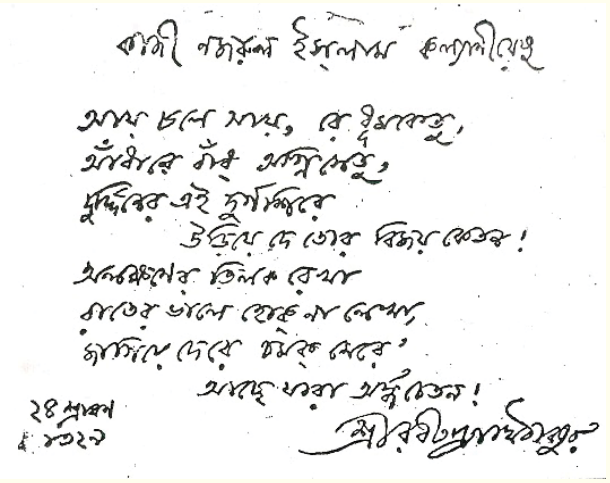

ধূমকেতুর জনপ্রিয়তার পেছনে রহস্য কী? এমন একটা প্রশ্ন চিত্তে দেখা দিতে পারে। *ধূমকেতুর* মধ্যে কী এমন নতুনত্ব থাকত যার জন্য বিপুল সংখ্যক পাঠক পরবর্তী সংখ্যার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকত। আবদুল আজীজ আল আমান *ধূমকেতুর নজরুল* গ্রন্থে লিখেছেন–

> এ প্রসঙ্গ প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, অগ্নিবর্ষ সম্পাদকীয় নিবন্ধাবলীর কথা। গতানুগতিক সম্পাদকীয় নয়, এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে নজরুল যেন তাঁর লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করতেন। দারুণ জ্বালাময়ী লেখা, অত্যন্ত উত্তেজক। সুতরাং পত্রিকা হাতে পেয়ে পাঠকবর্গ প্রথমেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। নজরুলের লেখা আগুন ঝরানো কবিতাবলি ছিল এ পত্রিকার অন্যতম দ্বিতীয় আকর্ষণ।[৮]

ধূমকেতুর বিচার বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে নজরুল যেমন করে বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনার মত প্রকাশ করেন *ধূমকেতুতে*। তেমনি *ধূমকেতুতে* নজরুলের মতাদর্শের লোকজনদের মত প্রকাশ করার সুযোগ করে দেন। নজরুল *ধূমকেতুতে* নারীদেরও মত প্রকাশের সুযোগ করে দেন।

ইংরেজ শাসনের সময় *ধূমকেতু* পত্রিকার মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের মুক্তির স্বপ্ন ফুটে উঠেছিল। এই পত্রিকাটিতে প্রগতিশীল ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রজ্বলিত। বাংলা সাহিত্য পত্রিকার জগতে নজরুলের *ধূমকেতু* চিরন্তন।

তথ্যসূত্র

১. সারোয়ার জাহান, 'নজরুল ও ধূমকেতু', *শতবর্ষে নজরুল ফিরে দেখা*, সম্পাদনা. বিষ্ণু বসু ও আবদুর রইফ, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৯, পৃ. ২৪১-২৪২

২. জহিরুল হক, 'সাংবাদিক নজরুল ও ধূমকেতু পত্রিকা', *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, ত্রিশতম সংকলন, সম্পাদক, রশীদ হায়দার, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১১০-১১১

৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'ধূমকেতু ও লাঙল', *পত্রিকায় নজরুলের কবিতা : পাঠান্তর-প্রসঙ্গ, নানা প্রসঙ্গে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৪

৪. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ধূমকেতু'র পথ, *নজরুলের প্রবন্ধ-সমগ্র*, সম্পাদনা, মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১১

৫. জহিরুল হক, '*সাংবাদিক নজরুল ও ধূমকেতু পত্রিকা*', নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ত্রিশতম সংকলন, সম্পাদক, রশিদ হায়দার, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৫

৬. কাজী নজরুল ইসলাম, '*রাজবন্দীর জবানবন্দী*', নজরুলের প্রবন্ধ-সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৭. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন*, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮২, পৃ. ১১

৮. ঐ, পৃ. ১১-১২

৯. সারোয়ার জাহান, 'নজরুল ও ধূমকেতু', *শতবর্ষে নজরুল ফিরে দেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

১০. ঐ, পৃ. ২৪৩-২৪৪

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য : লেখক ও নজরুল গবেষক

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩

এ বছর সরকার বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩-এ ভূষিত করেছে প্রশাসনের ২৮ জন কর্মকর্তা ছাড়াও সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানকে। ৩১শে জুলাই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পদকসহ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ দিন ব্যক্তিগত অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের ২ লাখ টাকা ছাড়াও দলগত অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের ৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে দলের প্রত্যেক সদস্যকে স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট ছাড়াও নগদ পুরস্কারের পাঁচ লাখ টাকা সদস্যদের মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা হয়। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট ও সম্মাননা পদক দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক পাওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠান দুটি হলো– খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। এর মধ্যে 'নীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার' শ্রেণিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল 'গবেষণা ও মানবকল্যাণে এর ব্যবহার' শ্রেণিতে এই পদকে ভূষিত হয়েছে।

এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে ২৮ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন শ্রেণিতে দলগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩-এ ভূষিত হয়েছেন। যে সকল শ্রেণিগুলোতে জনপ্রশাসন পদক দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো– 'সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা' শ্রেণি, 'উন্নয়ন প্রশাসন' শ্রেণি, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শ্রেণি, 'পরিবেশ উন্নয়ন' শ্রেণি, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন' শ্রেণি, 'দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা' শ্রেণি, 'সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শ্রেণি, 'অপরাধ প্রতিরোধ' শ্রেণি, 'জনসেবায় উদ্ভাবন' শ্রেণি, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শ্রেণিতে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা, মননশীলতা এবং উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির অধীনে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস প্রতিবছর ২৩শে জুলাই পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'প্রথমে সুশাসন, পাবলিক সার্ভিসে উদ্ভাবন'।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

বঙ্গবন্ধুর পরিবার ক্রীড়াঙ্গনের বাতিঘর

শামসুজ্জামান শামস

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী। ক্রীড়া বিশ্বে বাংলাদেশ আজ আপন মহিমায় এগিয়ে চলছে। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা, কাবাডি, গলফ, ভলিবল, জুডো, কারাতেসহ সব খেলাতেই বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা সাফল্য অর্জন করছে। ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট পরাশক্তিদের মাটিতে নামিয়ে আনছে অনায়াসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ বয়সে অসাধারণ ফুটবল খেলতেন। তিনি স্কুলজীবন থেকেই খেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে গড়ে উঠেছিল ফুটবল ও ভলিবল দল। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন স্কুল দলের

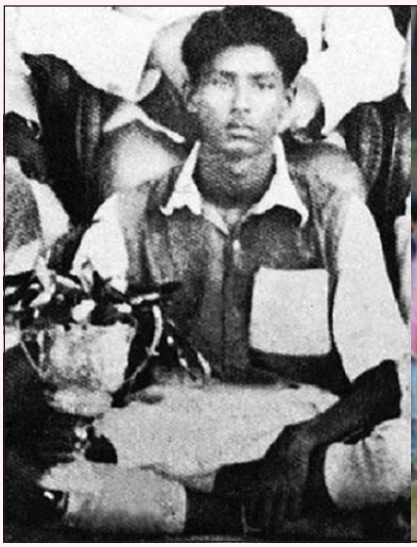

নিয়মিত সদস্য। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে অল্প দিনেই নিজেকে স্কুলের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে দাঁড় করান। ১৯৪০ সালে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় ওয়ান্ডারার্স ক্লাবটি ছিল নেতৃত্ব স্থানীয়। ঢাকার মাঠে ক্লাবটির দাপট ছিল অপ্রতিহত। বঙ্গবন্ধু তখন মাঠে নামতেন ওয়ান্ডারার্সের একজন নিয়মিত ফুটবলার হিসেবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। তিনি হয়ে ওঠেন ওয়ান্ডারার্সের নির্ভরতার প্রতীক। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেন, 'আমার আব্বাও ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। আর আমি মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আব্বার টিম ও আমার টিম যখন খেলা হতো তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভালো ছিল। মহকুমায় যারা ভালো খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।' তিনি আরও বলেছেন, 'অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবাই নামকরা খেলোয়াড়। বছরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচ দিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র, এগারোজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত।'

বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের জন্য লড়াই করতে গিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন নির্জন কারাগারে। তিনি ছিলেন নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মহান নেতা। তিনি বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎস। বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য, শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন মুক্ত করার জন্য যিনি 'রাজনীতি' বেছে নিয়েছিলেন সেই মহৎ মানুষটি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে বর্ণাঢ্য পদচারণা, রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত, রয়েছে ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ আর অবদানের অসংখ্য স্বাক্ষর। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র অর্জনে যে পরিবারটির সংগ্রাম-ত্যাগ-অবদানের কথা জাতির সামনে সুস্পষ্ট সেই পরিবারটিই বাংলাদেশের একটি বৃহৎ 'ক্রীড়া-পরিবার'।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নামে পরিচিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এটি বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাধীন ৫৪টি ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলা বিষয়ক সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সংক্ষেপে বাফুফে, বাংলাদেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা এটি। বাফুফের যাত্রাও শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ফুটবল ম্যাচ হয় ১৯৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় স্বাধীনতাকামী ফুটবলারদের নিয়ে

ঢাকা স্টেডিয়ামে এদিন একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়। খেলায় মুজিবনগর একাদশ ও প্রেসিডেন্ট একাদশ অংশ নেয়। ম্যাচটি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে সরাসরি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপভোগ করেন। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে কলকাতার মোহনবাগান দল এবং ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিন্সক ডায়নামো ক্লাব ঢাকায় খেলতে এলে খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে দাঁড় করাতে বঙ্গবন্ধু উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধানমন্ডিতে বর্তমান সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জন্য সাড়ে ১২ বিঘা জমি দেন। ১৯৭৫ সালে সরকারি অর্থে নির্মিত হয় কমপ্লেক্সের নিজস্ব ভবন।

আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের পথিকৃৎ শেখ কামাল: বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথই অনুসরণ করে গেছেন তাঁর দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামাল। এ দুই ভাইয়ের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শেখ কামাল। তিনি ফুটবল, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল তিনটি খেলাতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তবে ফুটবলে আনুষ্ঠানিকভাবে লিগে না খেললেও আবাহনীর হয়ে তিনি ক্রিকেট খেলেছেন। ক্রিকেটের মাঠে একজন দক্ষ অফ স্পিনার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আর বাস্কেটবল খেলেছেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের হয়ে। তাঁর অধিনায়কত্বে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বাস্কেটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। মহসীন স্মৃতি ট্রফিও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স জয় করে তাঁরই অধিনায়কত্বে। আজকের আবাহনী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামাল। শুরু থেকে এ ক্লাব শুধু আবাহনী ক্লাব নামে পরিচিত ছিল না। সেই সময় এ ক্লাবের নাম ছিল আবাহনী সমাজ কল্যাণ সমিতি। অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর জন্ম নেয় আবাহনী ক্রীড়া চক্র (বর্তমানে যা আবাহনী লিমিটেড নামে পরিচিত)।

১৯৭৩ সালে আবাহনীর কোচ হিসেবে শেখ কামাল নিয়োগ দিয়েছিলেন আইরিশ বিল হার্টকে। স্বাধীনতার পর হার্টই দেশে প্রথম বিদেশি ফুটবল কোচ। শেখ কামালকে বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্রীড়া চক্র আজ দেশ-বিদেশে পরিচিত একটি ক্লাব। ক্লাব ভবন থেকে শুরু করে সব কিছুতেই শেখ কামাল আধুনিকতার নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। শেখ কামাল বেঁচে থাকলে খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবলে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো বাংলাদেশ। দেশের ফুটবল ও ক্রিকেটের মান উন্নয়নে শেখ কামাল অক্লান্ত শ্রম দিয়েছিলেন। ক্রীড়া জগতে তিনি রেখেছেন অপরিসীম অবদান। পাশাপাশি নতুন খেলোয়াড় তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলেন। তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে একটি নাটক পশ্চিম বাংলার কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়েছে। এদিকে নাট্য অভিনয় ছাড়া তিনি ভালো সেতারবাদকও ছিলেন। ছায়ানটে সেতারবাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বলিষ্ঠ সংগঠক শেখ কামাল বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী। ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ছোটোবেলা থেকেই শেখ কামাল ছিলেন প্রচণ্ড ক্রীড়ানুরাগী। শাহীন স্কুলে পড়ার সময় স্কুল একাদশে নিয়মিত ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল খেলতেন। আজাদ বয়েজ ক্লাবের হয়ে শেখ কামাল প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে নিয়মিত খেলেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ কামাল শুধু খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ক্রীড়া সংগঠক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ই আগস্ট ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১০ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) পুরস্কার প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় এবং বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের প্রথম অধিনায়ক আব্দুস সাদেক আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও দক্ষিণ এশীয় স্বর্ণপদক জয়ী ভারোত্তোলক জিয়ারুল ইসলাম ক্রীড়াবিদ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন। টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মুহতাসিম আহমেদ হৃদয় এবং হকি খেলোয়াড় আমিরুল ইসলাম উদীয়মান ক্রীড়াবিদ পুরস্কার পেয়েছেন।

এদিকে ক্রীড়া সংগঠক ক্যাটাগরিতে তৃণমূল হকি সংগঠক ফজলুল ইসলাম এবং কলসিন্দুর সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মালা রানী সরকারকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

খন্দকার তারেক মো. নুরুল্লাহ ক্রীড়া সাংবাদিক পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশ তীরন্দাজ ফেডারেশন ক্রীড়া সংস্থা/ফেডারেশন/সংগঠক পুরস্কার এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স (বিএবি) স্পোর্টস স্পন্সর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

এছাড়া, মন্ত্রণালয় এই প্রথমবারের মতো শেখ কামাল এনএসসি পুরস্কারে ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ক্যাটাগরিতে ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার পুরস্কার পেলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার আতাহার আলী খান।

দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা কামাল: বাংলাদেশে আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রদূত শেখ কামালের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর বিয়ে হয়। সুলতানা খুকু শুধু একজন ভালো অ্যাথলেটই ছিলেন না, ছিলেন দক্ষ সংগঠকও। মেয়েরা যেন খেলাধুলায় মন ঢেলে দেয়, সে জন্য রীতিমতো কাউন্সিলিংও করতেন তিনি। ১৯৬৭ সালে মুসলিম গার্লস কলেজ থেকে এসএসসি পাস করেছিলেন সুলতানা খুকু। তার এক বছর আগেই জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের লংজাম্পে রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জিতে তাক লাগিয়ে দেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক গেমসে লংজাম্পে নতুন রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হন খুকু। ১৯৭০ সালে অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে লংজাম্পে মেয়েদের মধ্যে সেরা হন তিনি। ১৯৭৩ সালে ১০০ মিটার হার্ডলসেও প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন সদাহাস্য মেয়েটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম নারী ব্লু-খুকু। ১৯৭৩ সালে সুলতানা কামাল খুকু নিখিল ভারতে গ্রামীণ খেলাধুলায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু সুলতানা কামালকে বলেছিলেন, বাঙালির মান রাখতে পারবি তো? খুকু এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, পারব। কথা রাখতে পেরেছিলেন তিনি। পুরো ভারত থেকে আসা সেরা মেয়েদের পেছনে ফেলেন তিনি। পরে কোনো এক পুরস্কার বিতরণীতে বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে খুকুকে বলেছিলেন, 'তুই তো আমার সবচেয়ে প্রিয়।' খুকু তখনও বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ হননি।

ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে আপনজন, দায়িত্বশীল অভিভাবক, নিবেদিতপ্রাণ দর্শক, ক্রীড়াঙ্গনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি এতটাই ক্রীড়াপ্রেমী যে, যেখানে খেলা, শত ব্যস্ততার মাঝেও সেখানেই ছুটে যান। উৎসাহ জোগান লাল-সবুজ ক্রীড়াবিদদের। ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনাকালেই বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গনে বড়ো অর্জনগুলো স্পর্শ করেছে।

শুধু ক্রিকেট নয়, ক্রীড়া বিশ্বে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আপন মহিমায় জায়গা করে নিয়েছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে একজন ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর কারণে। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শত ব্যস্ততার মধ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের ৪টি ম্যাচের (তিনটি ওয়ানডে এবং একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ) মধ্যে তিনটি ম্যাচেই তিনি মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়া সফরে থাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটি মাঠে বসে দেখতে না পারলেও বিদেশের মাটিতে বসে টেলিভিশনে টাইগারদের ম্যাচ দেখেছেন। দেশবাসী টেলিভিশনে দেখেছে কখনো তামিম-মুশফিক-সৌম্য-সাব্বিরদের চার-ছক্কায় আবার কখনো মাশরাফি-তাসকিন-রুবেল-সাকিব-সানিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী। কখনো অনুপ্রাণিত করতে হাততালি দিয়েছেন। কখনো বিজয়ের মিছিলে যোগ দিয়েছেন জাতীয় গৌরবের লাল-সবুজের পতাকা হাতে। ক্রিকেট মাঠে তঁ ার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

ফুটবলের টানে অনেক বার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ছুটে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কীভাবে খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করতে হয় তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভালোভাবে জানেন। ২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় গেমসে বাংলাদেশ দল যাতে ভালো ফল করতে পারে, তার জন্য খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বহরের তিনশোর ওপরে খেলোয়াড়-কর্মকর্তার সঙ্গে কথাও বলেছেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে খেলোয়াড়রা পেয়েছিলেন এগিয়ে চলার প্রেরণা। এসএ গেমসে পদক জয়ের জন্য নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো যে মহৌষধ, সেই অর্থ পুরস্কারও এদিন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঐ দিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রীকে মনে হলো তিনি যেন খেলোয়াড়দের বন্ধু, 'হারলেই সব শেষ নয়। খেলায় হারজিত আছেই। তাই খেলোয়াড়দের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। খারাপ করলে সমালোচনা করে লেখা হয়, এটা উচিত নয়। এতে খেলোয়াড়দের মন ভেঙে যায় এবং গেমস চলাকালীন তাদের হতাশ করা যাবে না।' পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের এক ফাঁকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিন।'

ক্রীড়াঙ্গনে শেখ জামাল-শেখ রাসেল: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ জামালের স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য ২০১০ সালে একঝাঁক তারকা ফুটবলার নিয়ে ঘরোয়া ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড। ২০১০-২০১১ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয় করে হলুদ-নীল জার্সিধারীরা। ২০১১ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত পোখরা কাপ জিতেই অভিষেকটা রঙিন করে রেখেছে শেখ জামাল। আইএফ শিল্ডে দুরন্ত ফুটবল নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কলকাতার ফুটবল সমর্থকদের মন জয় করে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ক্লাবটি। ফাইনালে কলকাতা মোহামেডানের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হারলেও খেলেছে দারুণ। শিরোপা জয়ের বাসনা নিয়ে ভুটানে গিয়েছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড। কিংস কাপে প্রতিবেশী ভুটান, ভারত ও নেপালের তিন ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে শেখ জামাল। শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ে ভারতের অন্যতম শক্তিধর পুনে এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য ক্রীড়াঙ্গনে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় আসর হচ্ছে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ। এই প্রিমিয়ার লিগের জনপ্রিয় এক ক্লাব হচ্ছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। ২০১২-২০১৩ মৌসুমে ঘরোয়া ফুটবলে ট্রেবল জয়ী শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ২০১৪ সালে কলম্বো অনুষ্ঠিত এএফসি প্রেসিডেন্ট কাপের বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

আগস্ট মাস আমাদের জন্য কষ্টের মাস, শোকের মাস। ১৫ই আগস্ট প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে রক্তক্ষরণের দিন। বাঙালি হারায় তাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এদিন বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। শহিদ হন সপরিবার বঙ্গবন্ধু। বিদ্ধ হয় বাঙালি জাতীয়তা, স্বাধীন বাংলাদেশ। রচিত হয় সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম ইতিহাস। স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতক চক্রের হাতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন।

শামসুজ্জামান শামস: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

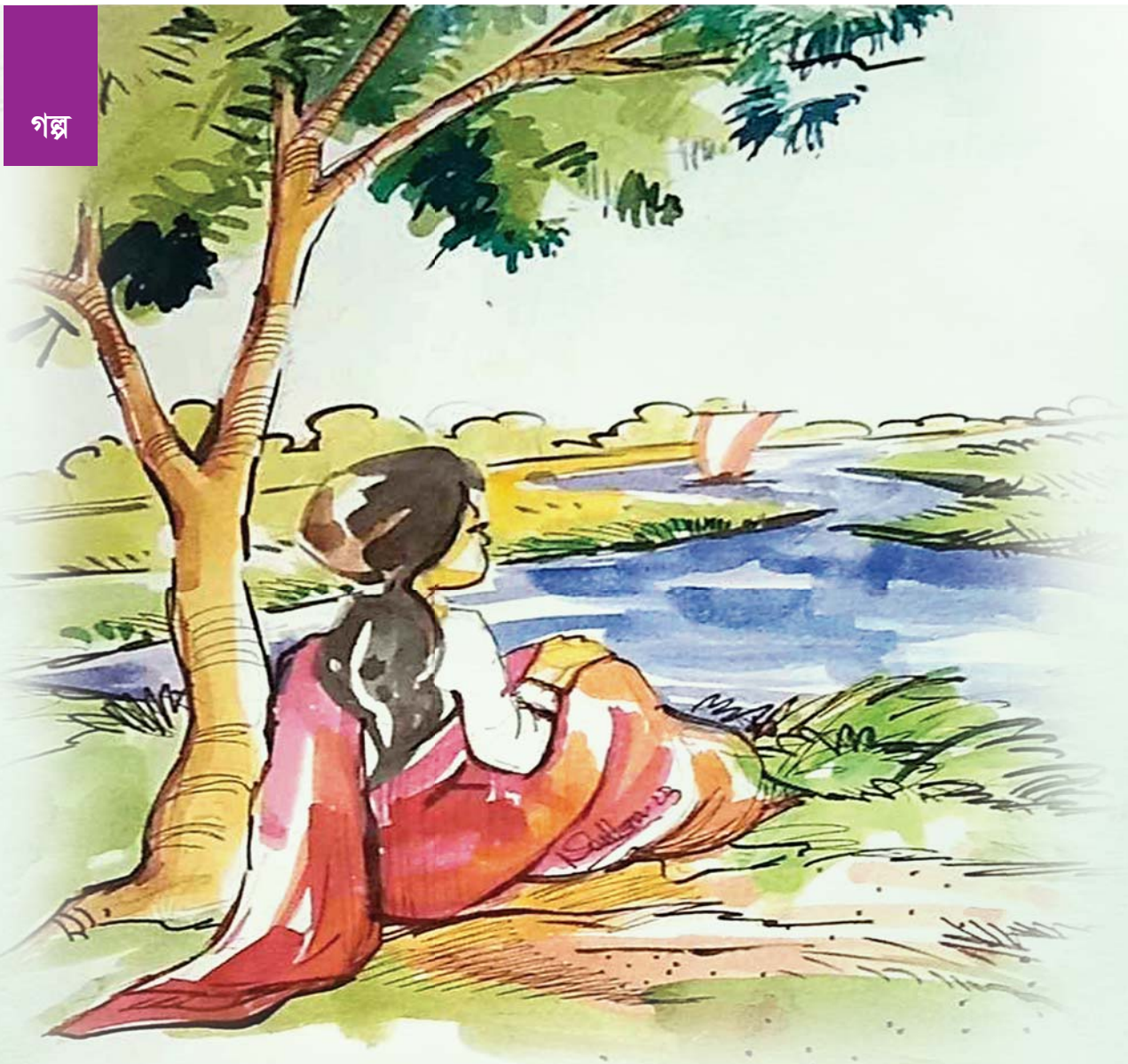

আন্ধারমানিকে ডুব সাঁতার

সেলিনা হোসেন

শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গোনা শেষ হয় তারানার। ভালোবাসার মানুষ পাওয়ার যে হাহাকার বুকের মধ্যে ছিল সেই দম-আটকানো অবস্থা আর নেই। এখন ওর বুকের গভীরে বয়ে যায় আন্ধারমানিক নদী। নদীর ধারে চুপচাপ বসে থাকে ও। নদীর দিকে তাকিয়ে বুক ভরে যায় তারানার। স্বামীর সংসারে এই নদী ওর আনন্দের সঙ্গী। আশপাশের মানুষেরা জানে ও নদীর ধারে বসে থাকতে ভালোবাসে। তারেকের সঙ্গে প্রেম হওয়ার পরে এই বসে থাকা আরও গভীর আনন্দের হয়েছে। জীবনে এমন একটি সময় আসবে এমন ধারণা স্বপ্নেও ছিল না। ওকে নদীর ধারে বসে থাকতে দেখে একদিন তারেক ওর ছোট্ট নৌকাটা পাড়ে ঠেকিয়ে নেমে এসেছিল। কাছে এসে বলেছিল, আপনি আমাদের গাঁয়ের বউ। আপনার মতো নদীর ধারে এমন করে কেউ বসে থাকে নাই। আপনি নদী খুব ভালোবাসেন না?

– হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি। আমার বাবার বাড়ির ধারে নদী ছিল না।

– আমি এই নদীতে মাছ ধরি।

– হ্যাঁ, জানি। আমি আপনাকে দেখেছি নৌকা নিয়ে চলে যেতে। আমার মনে হতো আমিও যদি এমন নৌকা বেয়ে যেতে পারতাম।

– খয়ের ভাইকে বলেন না কেন?

– ও এসব পছন্দ করে না। খালি ভাত রানতে বলে। কোথাও একটু বেড়াতেও নিয়ে যায় না।

– আমি নিয়ে যাব। যাবেন আমার সঙ্গে নদীতে ঘুরতে?

– যাব, যাব। অনেক দূরে যাব।

– কবে দিন ঠিক করেন।

– আচ্ছা দেখি।

– আজ আমি আসি। আমার খুব ভালো লেগেছে আপনার সঙ্গে কথা বলে। আপনি দেখতে যেমন সুন্দর, আপনার কথাও তেমন সুন্দর। আমি সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব। আন্ধারমানিক দুচোখ ভরে দেখবে আমাদেরকে।

– ঠিক। একদম ঠিক। আমি এমনই নদী চাই।

– আজকে যাই। আবার আসব। তারানার দু'চোখে উজ্জ্বল হাসি ছড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় তারেক। নৌকায় উঠে হাত নাড়ায়।

জমে ওঠে প্রেমের খেলা। তারানা রোজ বিকেলে এসে বসে

নদীর ধারে। সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যায়। বিকেলের ফিকে আলো ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় ফিকে আলোর স্নিগ্ধতা ওর মনোজগতে ভিন্ন আবেশ তৈরি করে। বিকেলের স্নিগ্ধ বাতাস ওকে ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় চারদিকে। এখন ওর জীবনে অন্যরকম সময় এসেছে। জীবনের এমন মধুর সময় ও ছাব্বিশ বছরে পায়নি। এ এক পরম পাওয়া। আন্ধারমানিক নদীর দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, নদীরে তুই আমার জীবনে এখন শুধু জোয়ার। আমার নদীতে ভাটির টান নাই। প্রেম তো জোয়ারই। অনেকদূরে জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। ও নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। নিজেকে বলে ওখানে আমার প্রেম আছে। আমি প্রেমের নদীতে ডুবে থাকি। আন্ধারমানিক নদীতে ভেসে বেড়াই আমি। তারেক আমার আন্ধারমানিক। ও আমার জোয়ারের জল। আমাকে বলে, তুমি আমার ফুলের কুঁড়ি। গাছের ছায়া। নানা উপমায় মন ভরিয়ে দেয় তারেক। দুজনের খুনসুটিতে ভরে ওঠে পড়ন্ত বিকেল। প্রতিদিন দেখা হয় না। চারদিকের লোক চলাচল দেখে তারেক আসে। নইলে মানুষের চোখে পড়বে ওদের সম্পর্ক।

একদিন তারেক জিজ্ঞেস করেছিল, খয়ের মিয়া তোমাকে কী নামে ডাকে?

তারানা শুকনো মুখে বলেছিল, হারামজাদী।

– কী বললে?

– হ্যাঁ, এই শব্দে ডাকে।

–যাক ভালোই হয়েছে। আমার প্রেমই তোমার জীবনে প্রথম।

– তুমি আমার আন্ধারমানিক। এই নদীর ধারে বসে আমার কাছে প্রেম এসেছে।

– একদিন বনের মধ্যে হাঁটতে যাব দুজনে। বুকে জড়িয়ে ধরব তোমাকে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে তারানা। তারেক মৃদু হেসে বলে, তোমার হাসি নদীর স্রোত। আজ যাই।

এভাবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে তারানার স্বস্তি। কেটে যায় কয়েক মাস।

তারেকের দিকে তাকালে ওর চোখ ফেরে না। তারেক নিজেও দুচোখ ভরে ওকে দেখে। পলকহীন তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটে মৃদু হাসি, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে বুকে জড়িয়ে। হয়ে যাবে রঙিন প্রজাপতি। এই প্রথম নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। রঙিন দিনগুলো আলোর ফুলকি ছড়ায়। তারানা খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। নিজেকে অনেক কষ্টে আড়াল করে।

মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যায় খয়েরের কাছে। ও চোখ গরম করে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোর কী হয়েছে? চেহারায় এত খুশি কেন?

– চেহারায় খুশি দেখা যায় নাকি? খুশি কি চোখে দেখার জিনিস?

–খবরদার, বেশি কথা বলবি না হারামজাদী।

স্বামীর মুখে গালি শুনে নিজেও রেগে ওঠে তারানা। চেঁচিয়ে বলে, তুইও একটা হারামজাদা। দশ বছর ধরে সংসার করলাম পোলাপানের দেখা নাই।

– তুই বাঁজা মাইয়ালোক।

– আমি বাঁজা না, তুই বাঁজা। হারামজাদা বেডা একটা।

ক্রুদ্ধ খয়ের বৌয়ের রণরঙ্গী মূর্তি দেখে থমকে যায়। আর কথা বাড়ায় না। ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেয়। বারান্দায় বসে থাকে তারানা। স্মৃতির পাতায় ফুটে ওঠে বাবা-মায়ের সংসার। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, বাবা-মায়ের প্রেমের সংসার। প্রেমের সংসারে হেসেখেলে ও বড়ো হয়েছে। এখন ও ছাব্বিশ বছর বয়সি। নদীর ধারে বসে জীবনের সুখ খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ভাবে, সুখ কী? আবার বাবা-মায়ের কথা মনে হয়। দুজনে কলেরায় মারা গেছে। ওর চোখের সামনে মাটিতে গড়াতে গড়াতে সকালবেলা মরে গেছে বাবা। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়েছিল ওর মা। ও নিজেও বাবার বুকের ওপর শুয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, বাজান গো, চোখ খোল, চোখ খোল। তোমার চোখের মণি দেখব।

বাবা চোখ খোলেনি। মাও কলেরায় তড়পাচ্ছিল। কথা বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুচোখ বন্ধ করে কাত হয়ে ঢলে পড়েছিল। চোখের সামনে বাবা-মায়ের মৃত্যু দেখা জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখের দিন। একদিনের সকাল-দুপুর ছিল তারানার জীবনের দীর্ঘতম সময়। এই সময়কে ও বুঝতে শিখেছিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সেদিন তারিখটা ছিল আটই ফাল্গুন। বসন্ত দিনের সুবাতাস ও প্রাণভরে নিজের নিশ্বাসে টেনেছিল। পাশাপাশি ব্যাকুল কান্নায় চিৎকার করে মাতিয়ে রেখেছিল ঘরবাড়ি। এই সময়ে ঘটে গেছে ওর পুরো জীবনের ঘটনা। যে ঘটনার রেশ গড়াতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। তখন তেরো বছরের বালিকা ছিল। প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে। ওদের গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, যেতে হবে পাশের গ্রামের সীমানায়। অনেক দূরে। একা একা এত দূরে পাঠাতে রাজি ছিল না ওর বাবা-মা। তাই পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের কেউ কেউ বলেছে, মেয়েটার মাথা ভালো। ওকে ঘরে বসায়ে রাখলি কেন? হোস্টেলে দিয়ে পড়ালেখা করা।

– দিনমজুরি করে ভাত খাই। কেমন করে হোস্টেলের টাকা দিব? চুরি করতে বলবেন নাকি?

– যা, পাগলামি করতে হবে না।

– পাগলামি না আযম ভাই, কষ্ট। স্কুলের ক্লাসে ফার্স্ট হয়। মাস্টাররা সবাই ওর প্রশংসা করে। আমার কইলজা ভরে যায়।

– লাভ কী তাতে? মেয়েটাতো পড়ালেখায় আগাতে পারল না। ভালো একটা চাকরিওতো করতে পারবে না।

মাথা নীচু করে দুহাতে চোখ মুছেছিল ওর বাবা হানিফ। বাড়িতে ফিরে ওর মায়ের কাছে একথা বললে ওর মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল। ওর বাবা মায়ের কপালে চুমু দিয়ে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়েছিল। ও দাঁড়িয়েছিল পাশে। মায়ের কান্না থামে না দেখে ওর বাবা চোখের উপর চুমু দিয়ে ঠোঁট ধরে রেখেছিল। মা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল বাবার ঠোঁট। তারপর নিজেকে সরিয়ে নেয়। দুজনে বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে। সেদিন ও বুঝেছিল দুজনে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। একসময় আমিনা খাতুন জোরে জোরে বলে, হোস্টেলের খরচের জন্য আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করব।

– না, না। আমি তা হতে দেব না।

হানিফ ঘাড় নাড়িয়ে কথা বলে। ঢোক গিলে। নিজের চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুল এলেমেলো করে।

– না, না কর কেন? কাজ করে টাকাতো থলিতে ভরব না। মেয়ের পড়ালেখায় খরচ হবে।

– মানুষের বাড়িতে কাজ করলেও হোস্টেলের টাকা হবে না গো।

– ধারদেনা কর। তাও ওর পড়ার খরচ চালাও। মেয়েটার মাথা ভালো, দেখতেও ফুটফুটে।

হা-হা করে হাসে হানিফ। হাসতে হাসতে বলে, মেয়েটার কপাল মন্দ।
– ঠিক বলেছেন বাজান।
তারানা উঁচু কণ্ঠে কথা বলে। নিজেও হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমিনা খাতুন অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। পড়ালেখা হবে না। এ নিয়ে কি ওর দুঃখ নাই? হানিফ ওর মাথায় হাত রেখে বলে, মা রে তুই ছাড়া আমাদের তো আর পোলাপান নাই। তোরে–
– থাক বাজান থাক, কষ্টের কথা আর বলতে হবে না। আমি আপনাদের কাছে থাকব। আমিও দিনমজুরি করব। অন্য কোথাও যাব না।
– তাহলে তোকে হাইস্কুলে ভর্তি করে দেই। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব। আবার নিয়ে আসব।
– ঠিক বলেছ। তোমার কাজ থাকলে আমি যাব। আমি ওকে স্কুল থেকে আনব।
– কেন? কেন আপনাদের যেতে হবে? আমিতো একাই স্কুলে যেতে পারব।
– না, তোকে একা যেতে দিব না। শয়তান পোলাপান তোর পিছে লাগবে। পাটক্ষেতে, ধানক্ষেতে টেনে নিয়ে যাবে। গায়ের জোরে তুই ওদের সঙ্গে পারবি না।
হানিফ বলে, তোর চেহারা নিয়ে আমরা খুশি না। আমরা দুইজনে গলা ধরে কান্দি।
তারানা বাবার কথা শুনে হাসে। রাস্তায় হাঁটলে লোকেরা বলে, ইস, মেয়েটা কী সুন্দর।
বাবা সঙ্গে থাকলে কড়া করে ধমক দেয়।
– খবরদার এমন কথা বলবে না। আমার মেয়ের দিকে তাকাবে না।
– দিনমজুরি করে বেটা দাপট দেখায়।
– কী বললি? দাঁড়া দেখাচ্ছি–
ছেলেটি দৌড়ে চলে যায়। তারানা বাবার হাত চেপে ধরে।
–বাজান আপনি ওদের পেছনে যাবেন না।
– তোর জন্য চিন্তায় মরে যাই।
– কেন আমার কী হবে?
– বড়ো হলে বুঝবি। চল যাই।
মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটতে থাকে হানিফ মিয়া।
বাবা-মা মরে যাওয়ার পরে চাচার কাছে ছিল দেড় বছর। চাচা ওকে বিয়ে দেয় ওর চাইতে বয়সে দ্বিগুণ বড়ো খয়ের মিয়ার সঙ্গে। লোকটির বয়সের কথা শুনে ও যখন কাঁদছিল তখন চাচা বলেছিল, তুইতো আমার ঘাড়ে বোঝা হয়েছিস। খয়েরকে যৌতুক দিতে হবে না। বেঁচে গেছি, লোকটার বৌ মরে গেছে। পোলাপান নাই। ভালোইতো হবে সংসার। আরামে থাকবি। অভাবের কষ্ট পাবি না।
– আমি বিয়ে করব না।
– খবরদার, একথা বলবি না। বিয়ে দিয়ে দিব। চলে যাবি।
– আমাকে ভাত খাওয়াতে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে?
– চুপ, কথা বলবি না। তোকে পাহারা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এখন স্বামীর কাছে যাবি। আমি রেহাই পাব।
– তাহলে যাই।
তারানা সেদিন দুহাতে চোখ মুছেছিল। শুধু বাবা-মায়ের কাছে ও প্রেমের স্বপ্ন দেখেছে। ঠিকমতো ভাত খাওয়া হয়নি বাবা-মায়ের কাছে, কিন্তু বুকভরা আনন্দ ছিল। এখন স্বামীর সংসারে পেট ভরা ভাত আছে, কিন্তু আনন্দ নাই। প্রেম নাই। শুধু শরীর নাড়াচাড়া আছে। প্রেম ছাড়া এই নাড়াচাড়ায় আনন্দ নাই। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, আমি ভালোবাসা চাই। ভালোবাসা।
তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খয়ের মিয়া। তারানাকে চোখ মুছতে দেখে থমকে দাঁড়ায়।
– কী হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন?
– ভালোবাসার জন্য।
– কেন, তুই ভালোবাসা পাস না?
– না, পাই না।
– দিব এক লাথি।
খয়ের মিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে ও দ্রুত সরে পড়ে। তারেকের মুখ ভেসে ওঠে। বুকের ভেতর ধ্বনিত হয় তারেকের কণ্ঠস্বর, ফুলকুঁড়ি আমার হাত ধরো। চলো আমরা ভেসে যাই। নদী থেকে সাগরে যাব। তারপর মহাসাগরে। আমাদের প্রেমের মহাসাগর। এমন ভাষা শোনার অপেক্ষায় ছিল ও। শিখেছিল বাবা-মায়ের জীবন থেকে। দুজনে ওর সামনে ভালোবাসার কথা বলে ওকে বুঝতে শিখিয়েছিল ভালোবাসা। কিন্তু খয়ের মিয়ার কাছ থেকে ভালোবাসার কোনো স্পর্শ পায়নি। বুকের শূন্যতা কামড়ে ধরে থাকে রাতদিন। বাবা-মায়ের মৃত্যু ওর জীবনে একদিনের সকাল-বিকেল।
তারেকের ভালোবাসা এই সকাল-বিকাল সময় ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে হৃদয়-জুড়ানো সৌরভ। ভাবে, বেঁচে থাকা কী সুন্দর। খয়ের মিয়ার গালমন্দ এখন ওকে আহত করে না। ওর সামনে নতুন দিনের চিন্তা। তারেকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন জীবনে ডুবসাঁতার দেবে।
এক সময় দুজনের প্রেম গ্রামের মানুষের চোখে পড়ে। নানা কথা কানে আসে খয়ের মিয়ার। নিজেও নদীর ধারে দেখতে পায় দুজনকে।
একদিন নদীর ধার থেকে ওকে তুলে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নদীতে। বলে, যা মর। মরে ভূত হ হারামজাদী।
তারানা ডুবে যায় নদীতে। সাঁতার দিয়ে আবার মাথা তোলে। দেখতে পায় দ্রুত নৌকা চালিয়ে এগিয়ে আসছে তারেক। নৌকা কাছে এনে বলে, উঠে আস ফুলকুঁড়ি। আমার হাত ধরো।
নৌকায় উঠে পড়ে তারানা। ভিজে শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, কী হলো আমাদের? খয়ের মিয়াতো আমাকে মরণে ঠেলে দিয়েছে। বলেছে মর।
– ভালোই করেছে। মরণের পরে আমরা এখন বেহেশতে আছি। আন্ধারমানিক আমাদের বেহেশত। খয়ের মিয়ার কাছ থেকে বেঁচে গিয়ে তোমার মরণ হয়েছে। তুমি এখন বেহেশতে। তোমার সঙ্গে আমিও বেহেশতে ঢুকেছি।
– বাহ! সুন্দর!
তারানা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কলকলিয়ে বলে, আন্ধারমানিক আন্ধারমানিক। প্রেমের নদী আন্ধারমানিক।
কণ্ঠস্বর ভেসে যায় নদীর চারদিক। নদীতে এখন জোয়ারের ভরা টান।

——— ○ ———

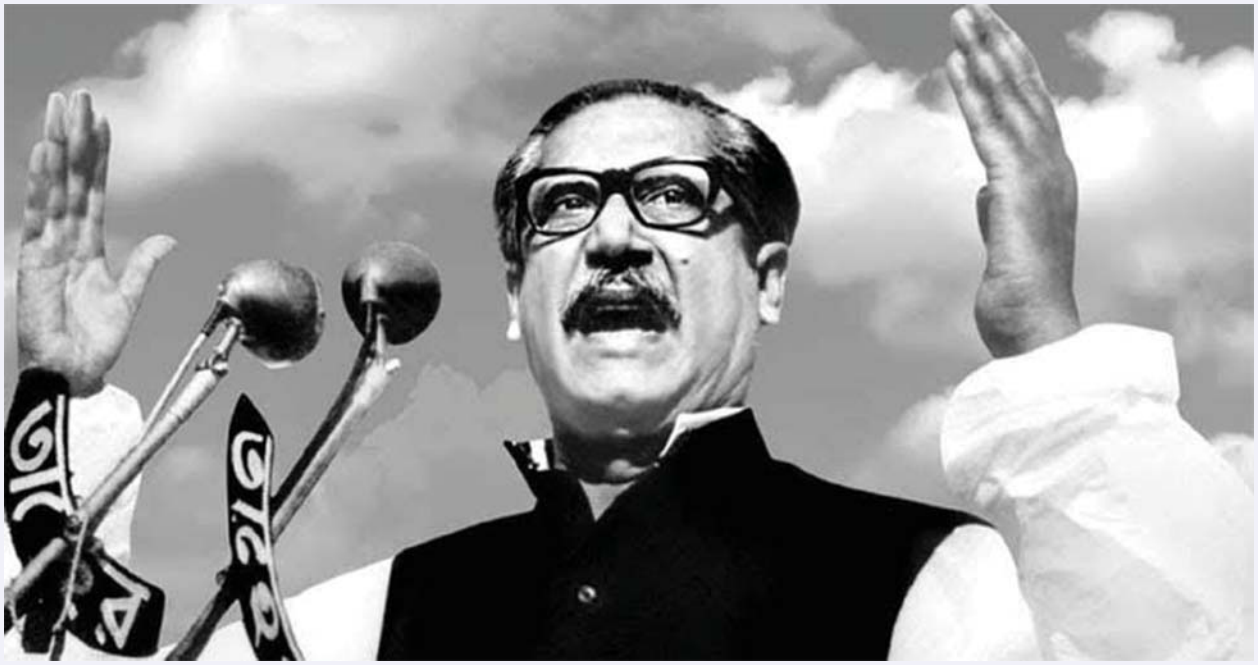

মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু

শেলী সেলিনা

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মহান নেতা দেখিনি, সে সময় আমার জন্ম হয়নি। আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কেননা আমাকে এমন একজন নেতার দেশে পাঠিয়েছেন যিনি জন্ম থেকেই মানুষের দুঃখকষ্টের কথা ভেবেছেন, নিজের খাবার অনাহারীর মুখে তুলে দিয়েই যাঁর পরম তৃপ্তি। বাঙালির মহান এই নেতা ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মহান এই নেতার জন্ম না হলে আমরা কখনোই স্বাধীনতা পেতাম না। তিনি বাঙালির মহাজাগরণের পথিকৃৎ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তিনি শুধু বাঙালির নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বাঙালির অধিকার রক্ষায় তিনি কখনো আপোশ করেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সারা বিশ্বে যে কজন ক্যারিশম্যাটিক লিডার ছিলেন, যেমন: আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, নেলসন ম্যান্ডেলা– বঙ্গবন্ধু তাঁদের মতো বিশ্ব নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কখনো নিজের কথা ভাবেননি। সারা জীবন এ বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তিনি ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী ছিলেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তেও তিনি বলেন, 'যেকোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোনো ভালো কাজ করতে পারে নাই এ বিশ্বাস আমার ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এদেশে রাজনীতি করতে হলে ত্যাগের প্রয়োজন আছে এবং ত্যাগ আমাদের করতে হবে। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ১২৮)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী প্রেরণা জনগণকে, জাতিকে পথ দেখিয়েছিল শত শত বছরের পরাধীন, হতাশাগ্রস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষাদীক্ষা বঞ্চিত মৃতপ্রায় বাঙালি জাতিকে। তিনি তাঁর জাদুকরী নেতৃত্বে উজ্জীবিত ও অণুপ্রাণিত করেছিলেন লক্ষ কোটি প্রাণের তাজা রক্তে, মা-বোনের সম্ভ্রমে ও বাংলার প্রতিটি মানুষের অশ্রুর নদী সাঁতারে। বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, লাল-সবুজ পতাকা। তিনি আমাদের হাতে দিয়েছেন একটি সংবিধান, দিয়েছেন প্রাণভরে জাতীয় সংগীত গাইবার আনন্দ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালি পেল স্বতন্ত্র ও স্বকীয় জাতিসত্তার পরিচিতি। এই পরিচিতি আমাদের জন্য গৌরবের, অহংকারের।

বঙ্গবন্ধু একটি বিস্ময়, একটি অগ্রযাত্রার নাম। বঙ্গবন্ধু একজন নেতা। একজন মহান নেতার যে সমস্ত গুণের অধিকারী হতে হয়, যেমন– দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, সম্মোহনী শক্তি, মানুষের চাহিদা ও মনমানসিকতা যথাযথভাবে নিরূপণ করার ক্ষমতা, যথাসময়ে কর্মসূচি গ্রহণ, লক্ষ্য স্থিরকরণ, লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকা, উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা, সাহস,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই ২০২৩ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কোর্ট প্রাঙ্গণে 'স্মৃতি চিরঞ্জীব' স্মারক সৌধ উদ্বোধন করেন -পিআইডি

আত্মপ্রত্যয়, ত্যাগের আদর্শ, দৃঢ় মনোবল ইত্যাদি অনেক গুণ শৈশব থেকে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে লক্ষণীয় ছিল।

বাংলাদেশের মানুষ আবেগপ্রবণ একথা ঠিক কিন্তু তাই বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিছক আবেগের তাড়নায় কারো প্ররোচনায় 'জাতির পিতা' বা 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়ে বরণ করে নেয়নি। এ দেশের হতভাগা, বঞ্চিত, সাধারণ, সহজসরল মানুষ জেনেছিল যে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন যার দ্বারা সম্ভব তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষণ বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু তাঁর সেই ভাষণ যখন রেকর্ডে শুনি, মনে হয় যেন এক নাবিক একাই তাঁর যাত্রী বোঝাই জাহাজের হাল ধরেছে আর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁর প্রিয় যাত্রীদের বলছে, 'ভয় পেয়ো না আমি আছি, আমি জন্ম থেকেই তোমাদের জন্য নিবেদিত।' ৭ই মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি জানতেন মুক্তি আমাদের নিশ্চিত। মূলত বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতার মূল স্থপতি, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সারথি ও মহানায়ক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু রণাঙ্গনের সৈনিকেরা ও স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা ঐ নয় মাস তাঁর দৃপ্ত উজ্জ্বল স্বপ্ন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখা পবিত্র মুখখানিকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, তাঁর বজ্রকণ্ঠের অমর বাণী 'জয় বাংলা' মন ও মননে ধারণ করে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার ব্রতে দীক্ষিত হয়ে অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু কখনো মৃত্যুকে ভয় পায়নি। কিন্তু তিনি কখনো কল্পনাও করেননি যে তাঁর হাতের অঙ্কিত সোনার বাংলায় তাঁকে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ঘাতকরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার মধ্যে দিয়েই যুদ্ধের ইতিহাস, বাঙালির মুক্তির ইতিহাস মুছে যাবে চিরতরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যে বাঙালির অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে তা মোছার ক্ষমতা কারো নেই।

খুনিরা জানত না যে বঙ্গবন্ধুর কখনো মৃত্যু হতে পারে না, বঙ্গবন্ধু বাঙালির চিন্তা-চেতনায়, বাংলার ইতিহাস ও গৌরবে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলজ্বল করবে যতদিন পৃথিবী থাকবে আপন মহিমায়।

শেলী সেলিনা: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী শিক্ষক, শুভাঢ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্থানে স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ

দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারক স্তম্ভ। সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে নির্মিত এই 'বঙ্গবন্ধু স্মারক স্তম্ভ' ২৮শে জুলাই উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যরা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধনের দিন বঙ্গবন্ধু যে স্থানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, ঠিক ঐ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মারক। ১৯৭২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি ম্যুরাল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্তম্ভে প্রথম সংবিধানে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরের ছবি, সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং সংবিধানের ৯৪ এবং ৯৫ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে আরও স্থান পেয়েছে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ৬৯ আইনজীবীর নাম। উন্নতমানের টাইলস ব্যবহার করে স্তম্ভটি নির্মাণ করে গণপূর্ত বিভাগ। স্মারক স্তম্ভের কাজ দ্রুত শেষ করতে গত এক মাস শ্রমিক-কর্মচারীরা টানা কাজ করেন বলে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। বঙ্গবন্ধু স্মারক স্তম্ভের বিষয়ে জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, স্মারক স্তম্ভটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, গত বছরের ১৮ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে বঙ্গবন্ধু স্মারক স্তম্ভ নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। স্বাধীনতার ৫২ বছর পর সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে জাতির পিতার স্মারক স্তম্ভ নির্মাণকে স্বাগত জানিয়েছেন আইনজীবীরা। তারা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই উদ্যোগটি প্রশংসনীয়।

প্রতিবেদন: নাফিজা তাবাস্‌সুম

দুঃখিনী দুই রাজকন্যা

সুজন বড়ুয়া

২০১০ সাল, শোকের মাস আগস্টের প্রথম দিন আজ। দুই বোন বসেছে পাঁচটি চিঠি নিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে এই চিঠি পাঁচটি লেখা হয়েছিল জার্মানি থেকে। চিঠির গায়ে ঠিকানা লেখা ছিল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি। ঠিকানা অনুযায়ী চিঠিগুলো এসেছিল নির্ভুলভাবে। জমা হয়েছিল লেটার বক্সে। কিন্তু লেটার বক্স খোলার সুযোগ পাননি প্রাপকরা। ভাগ্যের কী নিমর্ম পরিহাস, মুখ বন্ধ খামে সেই পাঁচটি চিঠি পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ আবার এসে পড়েছে প্রেরকের হাতে। চিঠিগুলোর প্রেরক শেখ রেহানা, দুই বোনের ছোটো বোন। বড়ো বোন শেখ হাসিনা আজ চিঠিগুলো নিয়ে এসেছে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে হঠাৎ শেখ রেহানার দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল ক্রমে। কী এক চাপা কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল ভেতরটা। সেই কবেকার কিশোরীবেলার কথা! চিঠির লেখা থেকে জার্মানির সেইসব স্মৃতি সবই কেমন ধূসর। ধূসর নয় শুধু চিঠির প্রাপকের মুখগুলো। ইস্, চিঠিগুলো ফেরত না পেয়ে যদি সেই প্রিয় মুখগুলোকে আবার ফিরে পাওয়া যেত! জীবনের কত দীর্ঘ সময় গড়িয়ে গেল, এখনো চোখ দুটো সেই প্রিয় মুখগুলোকেই খুঁজে বেড়ায়। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল মায়ামমতার নিবিড় বন্ধনে এত সুদৃঢ় একটি রাজ পরিবার হঠাৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে? কেউ কি ভেবেছিল কোনো এক নিকষ কালো রাতের অন্ধকারে রাজা, রানিমাতা, স্ত্রীসহ তাঁদের দুই যুবরাজ আর এক নিস্পাপ ফুলকুমারকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে? কেউ কি ভেবেছিল সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে কোনো এক সকালে দুই রাজকন্যার ঘুম ভাঙবে রাজার সপরিবার করুণ মৃত্যু সংবাদে? কেউ কি ভেবেছিল রাজা, রানি ও যুবরাজদের নির্মম মৃত্যুশোক বয়ে বেড়াবার জন্য শুধু দুই রাজকন্যাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে? কেউ না ভাবলেও ভাবনার অতীত সেই ঘটনাই বাস্তবে ঘটেছে, মনে হয় যেন সবটুকু বাস্তব নয়, রূপকথা, অবিশ্বাস্য এক রূপকথা। এখনো সেই ঘটনা মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয় সবই জীবন্ত, এই তো সেদিনের কথা।

রাজার সারা জীবনের সংগ্রাম সাধনায় পরাধীন দেশ স্বাধীন হলো। চারদিকে আনন্দের বন্যা। সবার মনে খুশির ঢেউ। দেশ গঠনে নিজেদের উজাড় করে দিলো সবাই। যুবরাজরাও মাতোয়ারা দেশের কাজে। রাজা-রানি ভাবলেন, যুবরাজদের এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। দেশ স্বাধীনের চার বছরের

মাথায় ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি যুবরাজদের বিয়ের আয়োজন হলো। বড়ো যুবরাজ শেখ কামাল আর মেজো যুবরাজ শেখ জামাল। দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতের দুই অপরূপা গুণী কন্যার সঙ্গে বিয়ে হলো দুই যুবরাজের। রাজবাড়িতে আনন্দ উপচে পড়ল।

কিন্তু বিয়ের সানাইয়ের পরপরই পরিবারে বেজে উঠল এক বিদায় রাগিণী। ৩০শে জুলাই বড়ো কন্যা-জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়া সপরিবার চলে যাবেন জার্মানি। তাঁদের ছোটো দুই পুত্র-কন্যা, জয় ও পুতুল। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। সেখানে দুটি চঞ্চল শিশুকে একা মাতার পক্ষে সামলানো কঠিন হবে। তাই ছোটো রাজকন্যাকেও জার্মানি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। ছোটো রাজকন্যার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ছুটি চলছে। এ সময় কিছুদিন বেড়িয়ে এলে ক্ষতি নেই। কিন্তু একসঙ্গে দুই রাজকন্যা চলে যাবে বলে বাবা-মাসহ সবারই মন খারাপ। এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে এসেও সবাই কাঁদল। ছোটো রাজকুমার রাসেল ছোটো রাজকন্যা রেহানার হাতই ছাড়তে চাইছিল না। তবু বিদায় দিতে হয়, তবু চলে যায়।

জার্মানিতে এসে প্রথমদিকে ভালোই লাগছিল ছোটো রাজকন্যা রেহানার। যা দেখে তা-ই নতুন, তা-ই সুন্দর! অন্যরকম অনুভূতিতে মন ভরে যায়। মনের মিষ্টি ভাবনা-অনুভূতিগুলো লিখে লিখে জানায় ঢাকার স্বজন- প্রিয়জনদের। এতে ওর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু এই উচ্ছল আনন্দ-খেলা এক সমান রইল না বেশিদিন। মা-বাবা, ভাই-ভাবিদের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। ঢাকায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে বড়োই। ১৩ই আগস্ট টেলিফোনে বাবাকে বলল, এখানে আর ভালো লাগছে না, তোমাদের কাছে ফিরে যেতে চাই। মনে হয় কতদিন হয়ে গেল, তোমাদের দেখি না।

বাবা হেসে বললেন, দুদিনেই সাধ মিটে গেল মা! ঠিক আছে, ভাবিস না, তোকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

ছোটো রাজকন্যা অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তাঁর অপেক্ষার পালা শেষ হয় না আর। তাঁর ঢাকায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা আর হলো না। ১৫ই আগস্ট সকালে তাঁর ঘুম ভাঙল বড়ো রাজকন্যা হাসু আপার বুকভাঙা কান্নার শব্দে। মুখে কোনো কথা নেই। আপা শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। কখনো ছোটো বোনকে জড়িয়ে ধরে, কখনো জয়-পুতুলকে। ছোটো বোনের চোখেও তখন জলের ধারা। অনেকক্ষণ পর হাসু আপা জানায়, ঢাকার বাসায় সামরিক ক্যু হয়েছে। তখনো দুই বোনের ধারণা, হয়ত কেউ কেউ বেঁচে আছে।

দুঃস্বপ্নের মতো এই সকালে রটল কী সৃষ্টিছাড়া দুঃসংবাদ! মুহূর্তেই এলোমেলো হয়ে গেল দুই বোনের জীবন। ড. ওয়াজেদ মিয়াসহ দুই বোন তখন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে, রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাসায়। এখান থেকে তাঁদের যাওয়ার কথা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। জার্মানির বন থেকে আচমকা রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী প্যারিস যাত্রা বাতিল করে ওয়াজেদ মিয়াকে সপরিবার অবিলম্বে বনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী দুই বোনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ করণীয় ঠিক করে ফেলেছেন। দুই বোনকে নিয়ে জার্মানির বনে পৌঁছলে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়াকে জানালেন, এখন আপনাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ দেশ ভারত। আপনাদের ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে হবে। দুই রাজকন্যার পক্ষে ওয়াজেদ মিয়া ভারত সরকারের কাছে তখনি আশ্রয় চাইলেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মায়ের মমতা দিয়ে বুকে টেনে নিলেন দুঃখিনী দুই রাজকন্যাকে। ঘটনার দশ দিন পর ২৫শে আগস্ট জার্মানির বন থেকে দুই রাজকন্যাকে নিয়ে ওয়াজেদ মিয়া পৌঁছলেন দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় দিল্লিতে থাকার ব্যবস্থা হলো তাঁদের। ভারতে তখন জরুরি অবস্থা চলছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো খবর-বার্তা ভারতের পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। সুতরাং বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা দুই রাজকন্যার তখনো প্রায় অজানা। তাঁদের চোখে কেবল অবিরাম জলের ধারা। কখনো হঠাৎ দুই বোন কেঁদে ওঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় বড়ো বোন চোখ মুছিয়ে দেয় ছোটো বোনের। আবার কখনো ছোটো বোন চোখ মুছিয়ে দেয় বড়ো বোনের। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই কারোই।

এভাবে কেটে গেল দুই সপ্তাহ। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দপ্তরে তলব করলেন বড়ো রাজকন্যা শেখ হাসিনাকে। রাত আটটায় স্বামী ওয়াজেদ মিয়াসহ শেখ হাসিনা হাজির হলো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দপ্তরে। দশ মিনিট পর প্রধানমন্ত্রী আসেন সেখানে। তিনি শেখ হাসিনার পাশে বসেন। পরম মমতায় শেখ হাসিনার মাথায় সান্ত্বনার স্পর্শ বুলিয়ে দেন। তারপর ওয়াজেদ মিয়ার কাছে জানতে চান ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা কতটুকু জানেন। ওয়াজেদ মিয়া *ভয়েস অব আমেরিকা* ও *রয়টার্সের* বরাত দিয়ে জানা তথ্য প্রধানমন্ত্রীকে শোনান। প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ভারতীয় কর্মকর্তাকে ঢাকার সর্বশেষ তথ্য জানানোর নির্দেশ দেন। কর্মকর্তা জানান, ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের কেউই বেঁচে নেই।

শেখ হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে আবার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। তারপর তিনি বলেন, তুমি যা হারিয়েছ কোনোভাবেই তা আর পূরণ হবার নয়। এখন থেকে তুমি তোমার ছেলেকে বাবা আর মেয়েকে মা বলে জানবে। ভেঙে পড়ো না, আমি তোমাদের পাশে আছি।

শেখ হাসিনা মাথার ওপর মায়ের স্নেহস্পর্শ অনুভব করলেন। প্রধানমন্ত্রী ওয়াজেদ মিয়ার চাকরির ব্যবস্থা করলেন।

দিল্লিতে দুই রাজকন্যার থাকা-খাওয়া নিশ্চিত হলো। কিন্তু তাঁদের বুকের ব্যথাভার নিরসন হলো না। কখনো নিরসন হওয়ার কথাও নয়। পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়ে এ দুঃখ-ব্যথা প্রশমন হবে না। কে সান্ত্বনা দেবে কাকে? দুজনের বুকের ক্ষত তো একই সমান। তবু বড়ো বোন ভাবে প্রাণপ্রিয় ছেটো বোনটির কথা। হায়রে বেচারি, কত ছোট্ট মানুষ! বাবা-মার কোনো আদর

সোহাগই বলতে গেলে সে পেল না। কী দুর্ভাগা জীবন! ভাবতে ভাবতে গোপনে চোখ মোছে বড়ো বোন। মনের কষ্ট আড়াল করে ভাত তুলে দেয় ছোটো বোনের মুখে। ছোটো বোনের চোখের জল শুকায় না। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি তো কিছু খাওনি আপা, তুমি খাও। আমি তোমাকে খাইয়ে দিই!

দিন যায়, রাত আসে, রাত যায়, দিন আসে। তবু দিন রাতের তফাৎ বুঝতে পারে না দুই রাজকন্যা। তাঁদের কাছে দিন রাত একই সমান। সুখ-দুঃখ বোধ তাঁদের নেই। বেঁচে থাকা তাঁদের কাছে যেন সম্পূর্ণ অর্থহীন। তবু দুই বোন বেঁচে থাকে পাথরের মূর্তির মতো।

কিন্তু জীবন তো পাথর নয়। জীবন তো থেমে থাকে না। জীবন এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে। জীবনই ১৯৭৬ সালে ছোটো রাজকন্যা শেখ রেহানাকে ডাক পাঠালো লন্ডনে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসেই ছোটো রাজকন্যার বিয়ে হলো সেখানে। জেলে বন্দি থাকায় বড়ো রাজকন্যার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেননি পিতা। মায়ের বড়ো সাধ ছিল, ছোটো রাজকন্যার বিয়ে দেবেন ধুমধামের সঙ্গে। হায়! বিয়ে ঠিকই হলো, কিন্তু সেই বাবা-মা, ভাই-ভাবি কেউই বিয়ে দেখতে পেলেন না। এমনই মন্দ ভাগ্য, শুধু একটি টিকিটের জন্য বড়ো বোন শেখ হাসিনাও উপস্থিত থাকতে পারল না ছোটো বোনের বিয়েতে।

তবু জীবন বয়ে চলল। ১৯৮১ সালে দিল্লিতে বড়ো রাজকন্যা সিদ্ধান্ত পাকা করল রাজনীতি শুরু করবে। ছোটো রাজকন্যা বলল, হাসু আপা, তোমার পাশে আছি। বাবার অসমাপ্ত সব স্বপ্ন সফল করতে হবে। তুমি রাজনীতি শুরু কর, জয়-পুতুলকে আমিই দেখব।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে এলো বড়ো রাজকন্যা। বড়ো প্রতিকূল, বড়ো পিচ্ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠ। কিন্তু সংগ্রামী পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের ধারক-বাহক শেখ হাসিনা, ছেড়ে কথা বলবে কেন? হাল ছাড়ার পাত্র সে নয়। পিতার প্রতিষ্ঠিত দলের কাণ্ডারি হলো। একে একে রুখে দাঁড়াতে লাগল সব অন্যায়-অনাচার। পিতার হত্যাকাণ্ডের দাবি তুলল জোর দিয়ে। দেশের মানুষ দলে দলে এগিয়ে এলো তাঁর সমর্থনে। তবু বার বার পা হড়কে যায় পিচ্ছিল কাদা মাটিতে। হাতে ধরা দিয়েও দেয় না চূড়ান্ত বিজয়।

এরই মধ্যে নেমে এলো এক পারিবারিক বিপর্যয়। ১৯৯১ সালে গুরুতর অসুস্থ হলো ছোটো বোন শেখ রেহানার স্বামী। পাশে এসে দাঁড়াল বড়ো বোন। নিয়ে গেল সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। নিবিড় চিকিৎসা চলল, দীর্ঘ সময় ধরে চলল যমে মানুষে টানাটানি। মানুষের জয় হলো, বড়ো বোনের জয় হলো। যমের মুখ থেকে বড়ো বোন ছিনিয়ে নিয়ে এলো ছোটো বোনের স্বামীকে। ছোটো বোন শেখ রেহানা আবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল, শেখ হাসিনা শুধু তাঁর বড়ো বোন নয়, তাঁর পিতা-মাতা-ভাই সবই, তাঁর পরম আশ্রয়। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির নাম শেখ হাসিনা। মানবীয় আদর্শের অপর নাম শেখ হাসিনা। ১৯৯৪ সালের ১৪ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে মানুষের জন্য জাদুঘর বানিয়ে উন্মুক্ত করে দিলো বড়ো রাজকন্যা। বলল, আজ থেকে এ বাড়ি জনগণের সম্পদ।

বাংলার জনগণও ঠিক চিনে নিলো বড়ো রাজকন্যাকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করল নিজের দল। এবার চূড়ান্ত বিজয় ধরা দিলো হাতে। প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হলো বড়ো রাজকন্যা শেখ হাসিনা। পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকাজ শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি জোগাল ছোটো রাজকন্যা শেখ রেহানা। কিন্তু পাঁচ বছরে বিচারকাজ শেষ করা গেল না। ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে গেল বড়ো রাজন্যার দল। চারদিকে সক্রিয় হলো স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তে মেতে উঠল রক্তের হোলি খেলায়। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে নেমে এলো আরেক দুর্যোগ। শেখ হাসিনার জনসমাবেশে বোমা হামলা চালাল দুষ্কৃতকারীরা। লক্ষ্য ছিল বড়ো রাজকন্যা। মরতে মরতে বেঁচে গেল ভাগ্যক্রমে। বিপদে দূর থেকে ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল ছোটো রাজকন্যা। হাতে হাত রেখে সংকট কাটিয়ে উঠল দুই বোন। মানুষ আবার চিনে নিতে শুরু করল স্বাধীনতার শত্রু-মিত্রকে। মানুষ চিনে ফেলল সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তিকে। মানুষ বুঝে গেল দেশ কার হাতে নিরাপদ। কার হাতে উন্নয়ন সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। ২০০৯ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সমর্থনে বাংলার জনগণ আবার বরণ করে নিলো জাতির পিতার কন্যাকে, ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনল বড়ো রাজকন্যার দলকে। দ্বিতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হলো বড়ো রাজকন্যা শেখ হাসিনা। দেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলো প্রগতিশীল ধারায়। জাতির পিতা হত্যার অসমাপ্ত বিচারকাজ শুরু করল আবার। বিচার সম্পন্ন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বড়ো রাজকন্যা চায় মানুষের মনে জাতির পিতার ভাবমূর্তি দিন দিন উজ্জ্বল হবে।

মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শনেও যায় বড়ো রাজকন্যা। আজও গিয়েছিল জাদুঘর দেখতে, স্বজনদের পরম প্রিয় স্পর্শ নিতে। আজ গিয়েই জাদুঘরে পেয়েছে স্মৃতি মেদুর মুখ বন্ধ খামের সেই পাঁচটি চিঠি, যা ছোটো রাজকন্যা জার্মানির বন থেকে লিখেছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সেই কবেকার কথা! এরমধ্যে মানুষের জীবনধারা পালটে গেছে কত! এখন চিঠির চলও উঠে গেছে প্রায়। এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, কম্পিউটার, ইমেইল, ইন্টারনেটের যুগ। এখন মানুষ চিঠি লেখে ফেসবুকের ইনবক্সে, ম্যাসেঞ্জারে, হোয়াটসঅ্যাপে।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে বুকটা কেমন করে উঠল ছোটো রাজকন্যার। ইস্, তখন যদি কম্পিউটার ইন্টারনেট থাকত, তবে এই চিঠিগুলো আর লেখা হতো না। আজ এত কষ্টও আর পেতে হতো না। কেন চিঠিগুলো আবার হাতে ফিরে এলো আজ? হৃদয় খুঁড়ে কেন আবার বেদনা জাগিয়ে তুলল?

দুই

আচ্ছা কী লেখা আছে চিঠিগুলোতে? কী লেখা হয়েছিল পাঁচটি চিঠিতে? খুলে দেখি না কেন একবার! কাঁপা কাঁপা হাতে প্রথম

চিঠিটা খুলল ছোটো রাজকন্যা শেখ রেহানা। পাশে দাঁড়িয়ে বড়ো রাজকন্যা দেখছে চুপচাপ। প্রথম চিঠিটা বাবাকে লেখা। কার্লসরুহে থেকে ০৫.০৮.১৯৭৫ তারিখে লেখা হয়েছিল।

আব্বা,

আমার সালাম নেবেন। আপনি কেমন আছেন? আমরা ভালো আছি। কার্লসরুহে খুব সুন্দর জায়গা। কিন্তু অসম্ভব গরম। গত রবিবার ব্ল্যাক ফরেস্ট গিয়েছিলাম। কিন্তু আব্বা জানেন, আমাদের রাঙামাটি থেকে খুব একটা পার্থক্য বুঝলাম না। এখানকার লোক খুব ভদ্র ও ভালো। আমি এখন অনেক কাজ করি। দুধ খাই, খাবার ঠিকমতো খাই। আজকে কামাল ভাইয়ের জন্মদিন। দোয়া করবেন।

আপনার স্নেহের রেহানা।

পড়তে পড়তে ছোটো রাজকন্যার দুচোখ ভরে এলো জলে। স্মৃতির পাখিরা কোথায় যেন ডানা ঝাপটে উঠল একসঙ্গে। মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে ছাদে বসে বাবার মাথার পাকা চুল বেছে দিত ছোটো রাজকন্যা। বাবার মাথার চুলের নীচে একটি কাটা দাগ ছিল। শেষদিকে একদিন পাকা চুল বাছার সময় বাবা বলেছিলেন, আমার এই কাটা দাগটা দেখে রাখ। আমার লাশ তো তোরা পাবি না, পেলেও চিনতে পারবি না। তখন এই কাটা দাগ দেখে যদি চিনতে পারিস, আরকি!

বাবার কথা শুনে মনটা খুব ভারি হয়ে গিয়েছিল ছোটো রাজকন্যার। বড়ো অভিমান হয়েছিল বাবার ওপর। ঝনঝনিয়ে বলেছিল, তুমি পলিটিক্স করো কেন বাবা?

বাবা মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। আদরমাখা কণ্ঠে মেয়েকে শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, তুই এমন করে বলিস কেন? আমার কাছে তুই যা, সাড়ে সাত কোটি মানুষও তা।

দেশের মানুষকে এত ভালোবেসে ছিলেন আব্বা, কী লাভ হলো! আপনার মরা মুখটাও আমরা দেখতে পেলাম না। ভেতরের কান্নার রোল চাপতে চাপতে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল ছোটো রাজকন্যা। এ চিঠিটা মাকে লেখা। বন থেকে ১১.০৮.১৯৭৫ তারিখে লেখা হয়েছিল।

আম্মা,

...পুতলী এখন অনেক কথা বলে। আব্বা ও তুমি কেমন আছো? আমি এখন অনেক কাজ করি। তোমার জন্য অনেক জিনিস কিনতে ইচ্ছে করে। সুন্দর সুন্দর জিনিস। কামাল ভাইয়ের বিয়ের পর এটাই প্রথম জন্মদিন। সুন্দর একটা প্রেজেন্ট দিও। দুলাভাইয়ের কাজ করে ১ মার্ক পেয়েছি। কালকে বেশি কাজ করলে ৫ মার্ক দেবে।

তোমার স্নেহের রেহানা

চিঠি পড়ে আর নিজেকে ভেতরে ভেতরে সামলায় ছোটো রাজকন্যা। আমাদের একটি হাসিখুশি ভালো খবরের জন্য সব সময় উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন মা। সারা জীবন কত কষ্ট করেছেন! নীরবে হাসিমুখে ধৈর্যের সঙ্গে সব পরিস্থিতি সামলেছেন। আব্বা বা কারো কাছে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। তবু কেন এভাবে প্রাণ দিতে হলো মাকে?

নিজের মনে তড়পাতে তড়পাতে তৃতীয় চিঠিটা খুলল ছোটো রাজকন্যা। এ চিঠিটা ছোটো ভাই রাসেলকে লেখা। ট্রিবার্গ থেকে ০৩.০৮.১৯৭৫ তারিখে লেখা হয়েছিল।

রাসুমণি

আজকে আমরা ট্রিবার্গ গিয়েছিলাম। জার্মানির সবচেয়ে বড়ো ঝরনা। অনেক উপরে উঠেছিলাম। এদের ভাষায় এটাকে বলে Wasserfalle। আজকে ব্ল্যাক ফরেস্ট গিয়েছিলাম।... মা'র কথা শুনবে। তোমার জন্য খেলনা কিনব। লন্ডনের চেয়ে এখানে অনেক দাম। ছোট্ট ছোট্ট গাড়িগুলো প্রায় দুই পাউন্ড দাম। তুমি ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া ও পড়াশুনা করো।

ইতি রেহানা আপা

আহ, রাসেল, ছোট্ট সোনা ভাইটি আমাদের! খেলনা বড়ো ভালোবাসত। সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখত একাই। ছোট্ট একরত্তি নিষ্পাপ একটি ছেলে। কী দোষ ছিল ওর? ওকেও সরিয়ে দিতে হলো পৃথিবী থেকে! কী কষ্ট! কী বেদনা! খান খান হয়ে যাচ্ছে ভেতরটা।

এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছোটো রাজকন্যা শেখ রেহানা। বড়ো রাজকন্যা শেখ হাসিনা হাত রাখে ছোটো বোনের পিঠের উপর। বড়ো রাজকন্যার চোখেও জল। ভাই-ভাবিদের কাছে লেখা অন্য চিঠিগুলো পড়ে রইল সামনে। সেগুলো পড়া হয় না আর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে দুই দুঃখিনী রাজকন্যা। কে নেবে তাঁদের ব্যথাভার? কে মুছিয়ে দেবে তঁদের চোখের জল? পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখিনী রাজকন্যা যে তাঁরা!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে মার্চ ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৭ জেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ৩৯ হাজার ৩৬৫ পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন করেন

আশ্রয়ণে পুনর্বাসিত পরিবারের পুষ্টি ভাবনা

মো. আবদুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতির ওপরই নির্ভর করে। তাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সীমিত জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙন, বিকল্প কর্মসৃষ্টির অভাব এসব কারণে বাংলাদেশে ভূমিহীন ও নদী ভাঙন পরিবারের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে। এরা শহরে এসে বস্তিতে কিংবা ফুটপাতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। এসব অসহায় দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থানরত এসব ছিন্নমূল, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারি খাসজমিতে পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে 'আশ্রয়ণ' নামক একটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। 'আশ্রয়ণ' মূলত মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক একটি সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সে সময় তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং এসব গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' নামের একটি প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সারা দেশে সরকারি খাসজমিতে ব্যারাক হাউস নির্মাণের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৪৩২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত সকল পরিবার পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসিত হবে। আশ্রয়ণ মানে কেবল আবাসনের ব্যবস্থা নয়; বরং এটির পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপকারভোগীরা বিনামূল্যে দুই শতাংশ করে জমি ও একটি অর্ধপাকা দুই কক্ষের টিনশেড ঘর পেয়েছেন। এতে রয়েছে গোসলখানা, টয়লেট, রান্নাঘর ও বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ। গৃহসহ জমি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে দলিল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় বাসগৃহের আশপাশের জমিতে পরিকল্পিতভাবে শাকসবজি ও ফলমূলের বাগান স্থাপনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত

পরিবারসমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূল বাজারে বিক্রি করে বাড়তি কিছু অর্থও উপার্জিত হবে। আবার প্রকল্প এলাকায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হবে। এসব গাছপালা একদিকে যেমন আশ্রয়ণে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের ছায়া, ফলমূল, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির জোগান দিবে, অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুস্থ ও নির্মল রাখতে সহায়ক হবে। তাছাড়া আশ্রয়ণ কেন্দ্রে প্রতি দশটি পরিবারের সুপেয় পানির জন্য থাকছে একটি করে নলকূপ। ফলে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন সুবিধাভোগীগণ। তাদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য নির্মিত হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। আশ্রয়ণের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন ও বিনোদনের জন্য প্রকল্প এলাকায় রয়েছে খেলার মাঠ। বস্তুত আশ্রয়ণ প্রকল্পে আধুনিক গ্রামের সকল নাগরিক সুবিধাই থাকছে।

এছাড়া উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে আয়বর্ধনকারী ব্যাবসা বা পেশা চালুর জন্য তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার মাতৃত্বকালীন, বয়স্ক, বিধবা বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদে পরিণত করে আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিবারসমূহের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্প এলাকার আশপাশের জমিতে শাকসবজি ও ফলমূলের চাষ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, ক্ষুদ্র জলাশয়ে মাছ চাষ এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম সফল করতে পুনর্বাসিত পরিবারের নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কেননা, প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের গ্রামীণ নারীরা প্রায় প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এদের খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও সেবা-যত্ন নারীরাই করে থাকেন। এদের মাংস ও ডিম আমাদের প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহ করে। গবাদিপশুর (গরু, ছাগল, ভেড়া) খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও তাদের পরিচর্যার মাধ্যমে গবাদিপশু পালন ও দুধ উৎপাদনেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের প্রোটিনের অভাব দূরীকরণে নারীরা তাদের বাসগৃহে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার গড়ে তুলতে পারেন। এছাড়া পুনর্বাসিত পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় খননকৃত ডোবা ও গর্ত জাতীয় ক্ষুদ্র জলাশয়ে মাছ চাষ করতে পারেন। এর ফলে একদিকে যেমন দেশে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হবে, অপরদিকে বাড়তি অংশ বিক্রি করে পুনর্বাসিত পরিবারের কিছু বাড়তি আয়েরও সংস্থান হবে।

শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শাকসবজি ও ফলমূল ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎকৃষ্ট উৎস। শাকসবজি ও ফলমূলে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান রয়েছে। তবে ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের দেহের এ গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান দুটির চাহিদার প্রায় সবটুকুই শাকসবজি ও ফলমূল থেকে পূরণ হয়ে থাকে। সুতরাং শরীরকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখার জন্য দৈনিক একজন শিশুর জন্য কমপক্ষে ১০০ গ্রাম ও একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য ২০০ গ্রাম শাকসবজি এবং ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক গড়ে প্রতিদিন ৩০ গ্রাম শাকসবজি ও ৭০ গ্রাম ফল খেয়ে থাকে। সুতরাং আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্য তথা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর শাকসবজি ও ফলের চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্প এলাকায় বাসগৃহের আশপাশের জমিতে বেশি করে শাকসবজি ও ফলের চাষ করা একান্ত প্রয়োজন। এসব জমিতে পরিকল্পিতভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফলের বাগান করে সব সময় টাটকা শাকসবজি ও ফল খাওয়া যায়। উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূল পুনর্বাসিত পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে বাড়তি কিছু অর্থও উপার্জন করা সম্ভব হবে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার জমিতে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীরা সক্রিয় অবদান রাখতে পারেন। গৃহস্থালির কাজে অভ্যস্ত একজন নারী অতি সহজেই শাকসবজি ও ফল চাষের সঙ্গে জড়িত কাজসমূহ যেমন– জমি প্রস্তুতকরণ, শাকসবজি ও ফলমূলের বীজ/চারারোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা বাছাই, পানি দেওয়া, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, ফসল তোলা, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এসব ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাছাড়া বাসগৃহের আশপাশের বাগান থেকে উপযুক্ত পরিমাণে শাকসবজি উত্তোলন ও সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অবলম্বন করে শাকসবজির পুষ্টিমান বজায় রাখার কাজও তারা অতি সহজেই করতে পারেন। এ বাগানে সবজি ও ফল চাষের আর একটি সুন্দর দিকও রয়েছে। এ ধরনের বাগানে বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরাও অংশ নিতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই বাগান করার অভ্যাস গড়ে ওঠার পাশাপাশি নিয়মিত শাকসবজি আর ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। বস্তুত আশ্রয়ণের জমিতে শাকসবজি ও ফল চাষের প্রতি পুনর্বাসিত নারীরা আগ্রহী ও যত্নবান হলে সবদিক থেকে লাভবান হতে পারবে।

সর্বোপরি আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে শাকসবজি, ফলমূল ও মাছ চাষ এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের জন্য পুনর্বাসিত নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান, প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠু বিপণনে সহযোগিতা, উপকরণ সরবরাহ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

মো. আবদুর রহমান: উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, রূপসা, খুলনা, rahman.rupsha@gmail.com

প্রযুক্তির দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে ডাকবাক্স

ডা. নূরল হক

এক সময় দেশের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল চিঠি। আর এই চিঠি ফেলতে হতো 'ডাকবাক্সে'। কালের স্রোতে আজ বিলুপ্ত প্রায় সেগুলো। রাস্তার মোড়ে গোল লম্বাটে বড়ো আকারের অথবা পোস্ট অফিসে চারকোণা লাল রঙের ডাকবাক্স ঝুলতে দেখা যেত। এগুলো এখন আর তেমন চোখে পড়ে না।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৫৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রথম ডাকবাক্স স্থাপন করা হয়। ১৮৪৮ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথম সর্বজনীন ডাকবাক্স স্থাপন করা হয় এবং ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রথম খাম্বা আকৃতির লাল ডাকবাক্স জার্সির সেন্ট হিলারে স্থাপন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডাকবাক্সকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন– গ্রেট ব্রিটেনে পোস্ট বক্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কালেকশন বক্স, মেইল বক্স, লেটার বক্স অথবা ড্রপবক্স ইত্যাদি নামে অভিহিত।

ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি ১৫১৬ সালে 'রয়েল মেইল' নামে প্রথম ডাক বা পোস্টাল সার্ভিস চালু করেন। এরপর রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ সালে প্রথম সাধারণ ডাক বা জেনারেল পোস্ট অফিস চালু করেন। ১৮৩০ সালে চিঠি আদান-প্রদানের জন্য বিশ্বে প্রথম মুদ্রিত খামের প্রচলন করা হয় এবং ১৮৪০ সালে ব্রিটেনে সর্বপ্রথম ডাকটিকিট চালু হয়।

এ দেশে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন শের শাহ। শের শাহ সুরি ছিলেন পঞ্চদশ শতকের একজন আফগান সৈনিক এবং তিনি পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট বাবরের সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন। শেষ পর্যায়ে তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ভারতবর্ষে তাম্র মুদ্রা চালু করেন এবং প্রথম ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় চুয়াডাঙ্গায়।

প্রাচীন আমলে যখন ডাক বিভাগ ছিল না, তখন চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো দূতের মাধ্যমে। আগের দিনে রাজা-বাদশাহ এবং নবাব বা সুলতানগণ এভাবেই এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে চিঠি আনা-নেওয়া করতেন। এছাড়াও কবুতরের পায়ে বেঁধে চিঠি পাঠানোর প্রচলনও ছিল। আর কবুতরকে একটা জায়গা চিনিয়ে দিলে ঠিকমতোই সেখানে নিয়ে চিঠি পৌঁছে দিতে পারত। এ পদ্ধতিগুলো ছিল সময় সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ। পরবর্তীতে চিঠির আদান-প্রদান সহজ এবং দ্রুততর করার জন্যই ডাক বিভাগ চালু করা হয়। আর এই ডাক বিভাগের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো ডাকবাক্স।

এশিয়া মহাদেশে উনিশ শতাব্দীর শেষদিকে ডাকবাক্স চালু হয়। সে সময় হংকং-এ স্থাপিত ডাকবাক্সগুলো কাঠের তৈরি ছিল। এরপর ধাতুর তৈরি থাম বাক্স আবির্ভূত হয়। ১৮৯০-এর দশক থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সকল ডাকবাক্স লাল রঙে রঞ্জিত ছিল। এরপর এগুলো সবুজ বা নীল রং করা হয়।

একসময় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবসহ সকল প্রিয়জনের কাছে মনের ভাব পাঠানোর একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। তখন তো আর এখনকার মতো ফোন আর মেসেঞ্জার ছিল না। ডাকবাক্সে একটা চিঠি ফেলে অপেক্ষা করতে হতো দিনের পর দিন। ডাকপিয়ন এসে সেই চিঠি তুলে নিয়ে যেত, তারপর ডাক বিভাগের মাধ্যমে সেই চিঠি জাহাজ কিংবা রেলে করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হতো। সেখান থেকে জবাব এলে আবার সেটা এসে জমা হতো সেই ডাকবাক্সে। ডাকপিয়নের কাজ ছিল ডাকবাক্স থেকে সেই চিঠিগুলো বের করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়া।

সমস্ত ভালোবাসা, আবেগ-অনুভূতি, দুঃখকষ্ট, মায়া-মমতা বহন করত এই চিঠিগুলো। দরকারি ও দাপ্তরিক চিঠি ছাড়াও ডাকবাক্সে জমে থাকত সন্তানের জন্য কত মায়ের ব্যাকুলতা, শহরে অবস্থানরত ছেলের গ্রামের পিতার কাছে টাকার জন্য আকুতি, স্বামী-স্ত্রী বা প্রিয়জনদের পরস্পরের ভালোবাসা আর আবেগ, কিংবা পত্র মিতালির আনন্দ ও অনুভূতি। সেসব চিঠি হলুদ খামের মোড়কে সেই লাল ডাকবাক্সে ফেলা হতো। চিঠিগুলো ছিল একেকটা সময়ের সাক্ষী। প্রিয়জনদের চিঠিগুলো বার বার পড়া হতো। প্রতিবারই ভালো লাগার একটা পরশ দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। অনেকে যুগের পর যুগ ধরে কোনো কোনো চিঠিকে সংরক্ষণ করতেন। প্রতিটি চিঠিই ছিল একেকটা স্মৃতির আধার।

তথ্যপ্রযুক্তির জগতে এখন আর সেই চিঠি লেখার প্রয়োজন পড়ে না। তাই তেমন আর ব্যবহার করা হয় না ডাকবাক্স। অবহেলা অযত্নে পড়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে ডাকবাক্সগুলো। এখন ঘরে বসেই বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের খবর নিমিষেই জানা যায়, আদান-প্রদান করা যায়। এখন আলোচনা হয়, কথার আদান-প্রদান হয় ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমু ও ই-মেইলে। তাই আমাদের মাঝ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সোনালি অতীতের ঐতিহ্যবাহী ডাকবাক্স। প্রিয়জনের একটা চিঠি বার বার পড়ার মাঝে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকত এখনকার সংক্ষিপ্ত ও তাৎক্ষণিক মেসেজে সেই আনন্দ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডা. নূরল হক: চিকিৎসক ও কলাম লেখক

বত্রিশ নম্বর

নাসির আহমেদ

একটি বাড়ির কাছে ঋণ
যেমন হাওয়ার কাছে প্রাণ
ঋণী হয়ে থাকে চিরদিন,
সে বাড়ির বুকে অভিমান।

এদেশের ফুল-পাখি-নদী
এবং সকল কলতান
এখানে মিশতো নিরবধি,
এখানে ছিলেন মহাপ্রাণ।

সমস্ত দেশের ছিল নাড়ি,
এ বাড়িতে পরম আশ্রয়
আজ অভিমানে সেই বাড়ি
অদৃশ্য অশ্রুর স্রোতে বয়।

এ বাড়ি ঠিকানা বাঙালির
অথচ নিষ্ঠুর রক্তপাতে
স্তব্ধ হয়ে গেল উচ্চশির!
পনেরো আগস্ট মধ্যরাতে!

এখনো দেয়ালে ক্ষতগুলো
এখনো শুকনো রক্তঘ্রাণ
এখানে উড়ছে স্মৃতি-ধুলো
বুক ভরা দুঃখ-অভিমান।

এখনো দেয়ালে কান পেতে
শুনি আর্তনাদ-আহাজারি
হত্যায় উঠেছে ওরা মেতে
বঙ্গবন্ধুসহ শিশু-নারী

সবাইকে খুন করে ওরা
পিশাচ-উল্লাসে মেতে ওঠে
যেনবা উন্মত্ত পাগলা ঘোড়া,
উন্মাদের হাসি জ্বলে ঠোঁটে!

এখানে এখনো শোনা যায়
সাইকেলের টুংটাং ধ্বনি
রাসেল আনন্দে ভেসে যায়
বঙ্গবন্ধু আসবেন এখনই।

বিশ্বাসঘাতক হন্তারক
কলুষিত করেছে এ বাড়ি
বাড়িটার বুকে বড়ো 'শক'
এ লাঞ্ছনা ভুলতে কি পারি!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আসলাম সানী

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
সপরিবার দেন প্রাণ
বিশ্বনেতা জাতির পিতা
শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রাণ হারালো বাংলাদেশের
আকাশ-বাতাস হায়!
সে রাত থেকেই বাংলার মাটি
কেঁদে বুক ভাসায়।

শোকেই শক্তি চেয়ে দেখো
লাল-সবুজ পতাকায়
বিশ্বকবির জাতীয় সংগীত
বিদ্রোহী জয় বাংলায়।

টুঙ্গিপাড়ার সমাধি সারা
বিশ্বে মারে টান
বাহান্ন-একাত্তরে অমর
শেখ মুজিবুর রহমান।

নিশঙ্ক আশ্রয়

দুখু বাঙাল

সিঁদুর আর পানপাতা রং পতাকার উদ্বেলিত উড়নের পাতে পাতে
ধ্বনিত হতে থাকে উদাত্তস্বর– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মানচিত্রে হাতবুলাই আর ভাবি তোমার বক্ষের ছাতি শুধুই কি
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল; নাকি আরও ঢের বিস্তৃত
এশিয়ার বেবাক শরীর।

ঝড়ো হাওয়ায় তোড় খাওয়া ছোট্ট পাখিটি শেষ পর্যন্ত যখন
স্মৃতিসৌধের চূড়ায় পা রাখে; তখন মনে হয়
তোমার তর্জনী বাঙালির নিশঙ্ক আশ্রয়।

নিজের চারপাশে ছিল সব আত্মহত্যার লালিত বাগান
তুমি যার বেড়ে ওঠায় কখনো সাধোনি বাধ
বিশ্বাসে বিসর্জন দিলে আপনায়।

অকস্মাৎ মুছে ফেলা ব্লাকবোর্ডের শূন্যতায় পৃথিবী আড়াল হলে
তখন তোমাকে দেখি– রৌদ্রের মিছিলে তুমি
অবিরাম ছিন্ন করো আঁধার-গুণ্ঠন।

কতদূর পৌঁছলে তোমার মোহনডাক আর কতটা বিস্তৃত হলে
তোমার সরল হাসি– ঘুচে যাবে বাঙালির
স্বপ্ন আর সাধনার মিলিত আকাল।

মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব

সোহরাব পাশা

বঙ্গবন্ধু, এই মৃত্তিকার সবখানে তোমার ছায়ার দাগ লেগে আছে।
চোখের উজ্জ্বল হাসি ঝরে পড়ে
অমিয় স্মৃতির দ্যুতিময় শব্দে
স্বরচিত আলো জ্বেলে হেঁটে গেছ তুমি বড়ো একা ক্লান্তিহীন বিনিদ্র আগুন পথে,

যাপনের সকাল দুপুর ভোরবেলা
বেদনার ভারী মেঘ বুকে পা ফেলেছো
দূর দিগন্তের শেষ প্রান্তে
আগুন দুপুরে কখনো খোঁজনি তুমি
বৃষ্টির আকাশ কিংবা ছায়াবৃক্ষ-উজ্জ্বল প্রশান্তি;

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাঁচার আর্তনাদ করোনি
ঘাতকের কাছে
তুমি ক্ষিপ্র অন্ধকার সময়কে থামিয়ে দিয়েছো
তোমার জীবনের চেয়ে প্রিয় এই বাংলাদেশের জন্যে, একটি লাল সূর্যের জন্যে
একটি পতাকার জন্যে
ভয়ংকর মেঘমুক্ত আকাশের জন্যে
রোদ্দুরভিজা স্নিগ্ধ ভোরের হাওয়ার জন্যে;

বঙ্গবন্ধু তুমি জেগে আছো প্রাণে প্রাণে
তোমার মৃত্যু নেই– মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি,

তুমি বাংলাদেশের অম্লান ইতিহাস
বাঙালি হৃদয়ের নিবিড় স্পন্দন
বাংলাদেশ দেখি আর তোমাকে দেখি
অবাক বিস্ময় চির জ্যোতির্ময়।

একজন মহীয়সী মা

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

আমি এক দ্যুতিময় মায়ের কথা বলছি
যাঁর এক হাতে আগুনের হিমালয়
অন্য হাতে স্নেহময় প্রশান্ত সাগর।
জনম দুঃখিনী সেই মা কখনো নিজের দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি
তিন বছরে পিতা হারালেন, পাঁচ বছরে মা-ও চলে যান মেঘের দেশে
এমন দুর্ভাগা জনম নিয়ে তবু তাঁর ঠোঁটে ছিল মমতার নহর;
হাসিমুখে পৃথিবীর তাবৎ ভালোবাসা বিলিয়েছেন দুখিদের ভেতর।

নিয়তি তাঁকে সঁপে দেয় এক বেদুইন বালকের হাতে
যিনি জন্মে ছিলেন অন্ধকারের বুক চিরে সূর্য জয়ের জন্যে
ঘর সংসার নিজস্ব সুখ সম্পদ কিছুই যাঁকে টানতো না
সেই বালকের জাদুর বাঁশি তাঁকেও টেনে নেয় লড়াইয়ের মাঠে।

শরীরে আটপৌঢ়ে শাড়ি, হাতে পানের বাটা, সাদামাটা বাঙালি নারী
অথচ জাদুর পরশপাথর তাঁকেও আগুন রঙে সজ্জিত করে
তিনিও দুঃখী মানুষের হাসির জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিলেন।

সিংহপুরুষ জন্ম যদি না নিত

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

মুজিব নামের সিংহপুরুষ জন্ম যদি না নিত
এই জাতি কি আদৌ হতো যুদ্ধে অনুপ্রাণিত?
কিংবা মুজিব প্রাণের মায়া
তুচ্ছ যদি না করতো
বাঙালিরা থাকতো আজও
ঘৃণ্য পোকামাকড় তো।
মুজিব ছিলেন অকুতোভয়, দুঃসাহসী প্রাণ
হুংকারে তার কেঁপে ওঠে আজব পাকিস্তান
তাঁর সাহসে জাগে জাতি, ভাঙে সবার নিদ্রা
জেগে ওঠে বৃদ্ধ-যুবা আর সে সমাজবিদরা।
এক জীবনে বারে বারে
যান মুজিবুর কারাগারে
তবু তিনি করেন নাতো আপোশ কিংবা রফা
বরং আরও মুক্তিসনদ দিলেন যে ছয় দফা।
সেই দফাতে জনমতের
জুটলো অনেক সাড়া
বীর বাঙালি শক্ত আরও
করল যে শিরদাড়া।
আবার হলো মামলা রজ্জু, বন্দি হলো ফের
বাঙালিরা শাসককে তাই পাইয়ে দিল টের।
বজ্র হাঁকে ডঙ্কা বাজে–
ভাঙবো জেলের তালা
বন্দি মুজিব মুক্তি পেয়ে
পরেন জয়ের মালা।
তৈরি হলো গণজোয়ার, আয়ুব গেল ভেসে
আরেক শাসক ইয়াহিয়া নেয় ক্ষমতা এসে।

সারা দেশেই সত্তরে বয় নির্বাচনের হাওয়া
তাতেই হলো নিরঙ্কুশে সব ম্যান্ডেট পাওয়া
তারপরে তো ঘটে কত
নানান রকম খেল
ততদিনে বাঙালি আর
নেইতো বেয়াক্কেল।
মার্চ মাসের সাত তারিখে রেসকোর্সে এসে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার আদেশ দিলেন শেষে।

সেই আদেশের সূত্র ধরে
বীর বাঙালি একাত্তরে
তিরিশ লাখের বিনিময়ে আনলো স্বাধীনতা
তাই ভুলি না শেখ মুজিবের শুদ্ধ স্মৃতিকথা।
কুড়ি সালে শেখ মুজিবুর জন্ম যদি না নিত
কেউ হতো না স্বাধীনতার যুদ্ধে অনুপ্রাণিত।

নিবন্ধ

দুর্গম পাহাড়ে সোলার প্যানেলের ডিজিটাল আলো

মো. রেজুয়ান খান

আগে যেখানে সন্ধ্যে নামলেই পাহাড়িরা কুপি, হারিকেন আর জোনাকি পোকার নিভু নিভু আলো দেখত, এখন সেখানকার মানুষ সোলার প্যানেলের ডিজিটাল আলো ঝলসানো ফোয়ারা দেখছে। আলোয় আলোয় এখানকার মানুষের জীবন সুখ ও আনন্দে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, ডিশ অ্যান্টেনাসহ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এখানকার কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা মেতে উঠেছে সর্বত্রই। সৌর আলোয় মানুষ রাতের আঁধারে এখন আগের চেয়ে কর্মে বেশি মনোনিবেশ করতে পারছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্বার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি ঘোষণাকে বাস্তব রূপ দিতে বরাবরই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণের জন্য এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেননি। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের জনগণও এখন সমতলের মানুষের ন্যায় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। সন্ধ্যের পর পার্বত্য অঞ্চল এখন আর আগের মতো আঁধার আর সুনসান নীরবতায় ঢাকা থাকে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে বিনামূল্যে সোলার প্যানেলের আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভৌগোলিক দুর্গমতার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে আগামী কয়েক দশকেও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় গ্রিড লাইনের বিদ্যুতের আওতায় আনা সম্ভব নয়। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় হাজার হাজার মানুষ দুর্গম পাহাড়ের কোলে বসবাস করে আসছে। ছোটো ছোটো পাড়া গড়ে তোলে ২০ থেকে ৮০টি পরিবার নিয়ে সেখানে তারা বসবাস করছে। সরকারের সামাজিক সেবাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে জাতীয় গ্রিড লাইনের বিদ্যুৎ সেবা দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত ৪০ হাজার মানুষের জন্য সোলার হোম সিস্টেম মোবাইল বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এছাড়া কমিউনিটি সিস্টেমে পাড়া কেন্দ্র, ছাত্র হোস্টেল, অনাথ আশ্রম কেন্দ্র ও এতিমখানায় ২ হাজার ৫০০ প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেলের ডিজিটাল মোবাইল বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

সোলার প্যানেল হলো ছোটো আকারের মোবাইল সিস্টেমের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কেন্দ্র। সোলার প্যানেল বিভিন্ন ফটোভোল্টাইক (পিভি) ভোল্টেজ ও ওয়াটজে বিভক্ত থাকে। সোলার হোম সিস্টেম একেকটি ১০০ ওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। সোলার কমিউনিটি সিস্টেম ৩০০ ওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। সোলার প্যানেল মূলত এর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। প্রতিটি সোলার প্যানেলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও বিতরণের জন্য একটি চার্জ কন্ট্রোলার থাকে। চার্জ কন্ট্রোলারটি চার্জার ব্যাটারি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চার্জার ব্যাটারির ওজন ২৫ থেকে ২৬ কেজি হয়ে থাকে। ব্যাটারিটি জেলযুক্ত থাকে। এটাতে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সোলার হোম সিস্টেম প্যানেলের সাহায্যে ৪টি এলইডি বাল্ব, একটি পাখা, একটি টিভি ও একটি মোবাইল চার্জার চালানো যায়। সুষ্ঠু ও সঠিক নিয়মে এর ব্যবহার করলে চার্জ কন্ট্রোলারটির ওয়ারেন্টি থাকে ২০ বছরের।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ইতঃপূর্বে দুর্গম এলাকার ১০ হাজার পরিবারকে সোলার প্যানেল বিতরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রদান করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। সোলার প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪০ হাজার সোলার হোম সিস্টেম এবং ২ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি সোলার প্যানেল বিতরণ কাজ ২০২৩ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ৩রা জুন ২০২৩ খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী দুর্গম এলাকায় ৯৫৪ পরিবারের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত উপকারভোগীদের মাঝে এ পর্যন্ত বান্দরবান জেলায় ১৪ হাজার পরিবার, রাঙ্গামাটি জেলায় ১৩ হাজার পরিবার এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ১৩ হাজার পরিবারকে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। একইভাবে বান্দরবান জেলায় ৯০০টি প্রতিষ্ঠান, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮০০টি প্রতিষ্ঠান ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৮০০টি প্রতিষ্ঠানকে সোলার কমিউনিটি সিস্টেম

বিতরণের জন্য বিভাজন করা হয়েছে। সকল উপকারভোগীদের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণ করা হয়েছে। সোলার প্যানেল সঠিকভাবে পরিচালনা ও ব্যবহার পদ্ধতি আয়ত্তে রাখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রত্যেক পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৬৫০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সোলার প্যানেলটি বহন করা ও প্রতিস্থাপনের জন্য আরও ৬৫০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে প্রতিটি পরিবারকে। ২১৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২০ সাল থেকে জুন ২০২৩-এর মধ্যে সোলার প্যানেল প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সোলার প্যানেল স্থাপনের আরও একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গিকার ও নির্দেশনাকে বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেন সোলার প্যানেলের মাধ্যমে আলোর হাট বসেছে। সোলার প্যানেলের আলো দেখতে পেয়ে পাহাড়ি দুর্গম এলাকার মানুষ অনেক খুশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সবখানেই আলোর ঝলকানি। পাহাড়ি সহজসরল বৃদ্ধ, নবীন সবাই এখন অন্ধকারের বুকে আলো জ্বলতে দেখছে। বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুতের সুবিধা পেয়ে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জীবনমান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। যার সুফল দেশের অর্থনীতির গতিকেও সম্প্রসারিত করেছে।

কমিউনিটি সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বঞ্চিত পাড়া কেন্দ্র, ছাত্র হোস্টেল, অনাথ আশ্রম কেন্দ্র ও এতিমখানায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় আগের চেয়ে অনেক ভালো করছে। তারা জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনছে। সোলার প্যানেলের আলো পেয়ে উপকারভোগীদের মধ্যে আনন্দের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের বল্টু, গাছেমন পাড়া গ্রামের মিতা চাকমা উচ্ছ্বাসের সাথে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাদের পাহাড়িদের জন্য বিদ্যুতের সুবিধা করে দিয়েছেন। কই আগের কোনো সরকারই তো পাহাড়ি জনগণের জন্য কিছু করে নাই। ঘরে সোলার বিদ্যুৎ পাওয়ায় আমার ৩ ছেলে-মেয়ে পড়াশুনায় আগের চেয়ে অনেক মনোযোগী হয়েছে। স্কুলে তারা ভালো করছে। রাতে আমাদের কাজ-কামে অনেক সুবিধা হচ্ছে।' তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া ভুলানগাছ, মনপাড়ার জুম চাষি জয়ধন তঞ্চংগা, রূপন, বিমল চন্দ্র, সূর্যমনি তঞ্চংগা, কলুইতলীর বৃদ্ধা যতীন মালা সোলারের আলো পেয়ে বেজায় খুশি। সবাই দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বালুখালী ইউনিয়নের খারিক্রং নিশিপাড়ার হৃদয় রঞ্জন, নোয়ামনি পাড়ার হৃশিতাসহ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি ও খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির বাটনাতলী ইউনিয়নের উপকারভোগীরা সোলার প্যানেল পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি একই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক দুর্গম গ্রাম রয়েছে, যেখানে কখনও বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেসব গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত বাসিন্দাদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিনামূল্যে সোলার প্যানেল সিস্টেম দিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি পাহাড়ি প্রত্যন্ত মানুষদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সোলার প্যানেলগুলো পৌঁছে দিচ্ছেন। সরকারের একজন মন্ত্রী পাহাড়ি দুর্গম এলাকাগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার নিয়ে ছুটে চলেছেন, এতে এলাকাবাসী বেজায় খুশি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার মানুষ আজ বিদ্যুতের সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছে। প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গিকার নিয়েছিলেন তিনি, তারই বাস্তবায়ন এটি।

মো. রেজুয়ান খান: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ডিজিটাল জরিপের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

চট্টগ্রামে বিডিএস রোলআউটের মধ্য দিয়ে সারা দেশে ৬ই আগস্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) মিলনায়তনে বিডিএস রোলআউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ভূমি সচিব মো. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের মূল উদ্দেশ্য অল্প সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে তথা ভূ-সম্পদ জরিপ শেষ করা এবং পরবর্তীতে মাঠে গিয়ে সার্ভের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে নিয়ে আসা। এছাড়া কোনো এলাকায় প্রাকৃতিক কারণে বড়ো ধরনের ভূমির বিচ্যুতি না ঘটলে রিভিশন্যাল সার্ভের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না ডিজিটাল ম্যাপ পার্টিশনের সুবিধার জন্য। তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের খসড়া আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে পাঠানো সম্ভব হবে। অবৈধ জমি দখলের দিন ফুরিয়ে আসছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, অবৈধ জমি দখলের জন্য জেল ও জরিমানা–দুটিরই ব্যবস্থা আছে এই আইনে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩রা আগস্ট পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিডিএস পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছিলেন ভূমিমন্ত্রী। পাইলটের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে আজ চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণাঙ্গ বিডিএস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: পপি আক্তার

নিবন্ধ

রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুটি রেকর্ড

উষা রানী রায়

রপ্তানি বলতে সাধারণ একটি দেশে উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে বিক্রয় করাকে বোঝায়। বৃহৎ অর্থে দেশের ভেতরে উৎপাদনের সব উপকরণ যথাযথ ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করার পরে অবশিষ্ট অংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বিশ্ববাজারে বিক্রয় করাকে রপ্তানি বলে। একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে দেশের ভেতরে পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। বাংলাদেশ সরকারের নীতি, সহযোগিতা ও প্রণোদনায় রপ্তানি খাত সুসংহত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আশাব্যঞ্জক দুটি রেকর্ড রপ্তানির ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। রেকর্ড দুটি হলো– চীনকে টপকে ইউরোপে পোশাক রপ্তানির শীর্ষে বাংলাদেশ এবং জুলাই মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪ দশমিক ৫৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইউরোপে পোশাক রপ্তানির পরিমাণে শীর্ষে বাংলাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পোশাক রপ্তানির পরিমাণে প্রথমবারের মতো শীর্ষে উঠে এলো বাংলাদেশ। কয়েক দশক ধরে শীর্ষ স্থানটি চীনের দখলে ছিল। ২০২২ পঞ্জিকা বছরে ইইউ'র ২৭ দেশে ১৩৩ কোটি কেজি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। চীন রপ্তানি করেছে ১৩১ কোটি কেজি পোশাক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও চীনের দ্বিগুণ। আগের বছরের চেয়ে গত বছর ইইউ জোটে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ২১ শতাংশ, যা ১২ শতাংশেরও কম চীনের। ইইউ'র সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরিসংখ্যান বলছে, পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামের অবস্থান পঞ্চম। ইইউতে মাত্র ১৫ কোটি কেজি পোশাক রপ্তানি করে দেশটি। জোটে রপ্তানির পরিমাণে তুরস্ক রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। গত বছর তুরস্কের ৪৭ কোটি কেজি পোশাক গেছে ইইউতে। ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ২১ কোটি কেজি।

অবশ্য পরিমাণে চীনকে ছাড়িয়ে গেলেও অর্থমূল্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখনও চীনের পেছনে। পরিসংখ্যান বলছে, ইইউ'র দেশগুলোতে গত বছর ৩ হাজার ১৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ২ হাজার ২৮৯ কোটি ডলারের। তবে এ ক্ষেত্রে চীনের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও প্রবৃদ্ধির হিসাবে দ্বিগুণ এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। গত বছর অর্থমূল্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৩৬ শতাংশ, যেখানে চীনের এ হার ১৭ শতাংশ। ইইউতে রপ্তানিতে সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিই সবচেয়ে বেশি।

পরিমাণে বেশি রপ্তানি সত্ত্বেও অর্থমূল্যে চীনের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার কারণ সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা বলেন, চীনের পোশাক খাতের ভিত্তি এখনও অনেক মজবুত। চীনের বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং ফাংশনাল পোশাক বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশ এখনও মৌলিক মানের পোশাকই বেশি করে থাকে।

ব্যবসায়ীরা বলেন, এ কারণে পরিমাণে বেশি রপ্তানি করেও মূল্য বিবেচনায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। চীনের অবস্থানে যেতে বাংলাদেশের আরও অনেক সময় প্রয়োজন হবে। অবশ্য বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা উচ্চমূল্যের টেকনিক্যাল পোশাক উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছেন। এসব পোশাকের মূল্য অনেক বেশি। গড়ে ৯০ থেকে ১০০ ডলার দামে এসব পোশাক রপ্তানি করা হচ্ছে। এ ধরনের উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদন এবং রপ্তানি বাড়ছে বলেই দর বেশি পাওয়া যাচ্ছে। সংকটের মধ্যেও রপ্তানি বাড়ছে।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর ইইউতে বাংলাদেশের পোশাকের মূল্য বেড়েছে প্রায় ১২ শতাংশ। চীনের পোশাকের মূল্য বেড়েছে ৫ শতাংশের কিছু কম। ভিয়েতনামের পোশাকের দর বেড়েছে ৩ শতাংশের মতো। গত বছর ইইউভুক্ত দেশগুলোতে ৩ শতাংশ হারে পোশাকের দাম বেড়েছে।

জুলাই মাসে রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৫৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

জুলাই মাসে রপ্তানি আয় এলো ৪ দশমিক ৫৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৫ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি। জুলাই মাসে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরিপোশাকেও শুভসূচনা হয়েছে। ২রা আগস্ট রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৬২ বিলিয়ন ডলার। জুলাই মাসের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪

দশমিক ৪৮১ বিলিয়ন ডলারের। প্রথম মাস জুলাইয়ে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরিপোশাক রপ্তানিতেও অর্থবছরের প্রথম মাসেই শুভ সূচনা হয়েছে। প্রথম মাসে ৩ দশমিক ৭৭৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ৩ দশমিক ৯৫৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরিপোশাক, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি এবং আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেশি। গত বছরে একই সময়ে ৩ দশমিক ৩৬৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরিপোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

তৈরিপোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো করেছে নিট তৈরিপোশাক। জুলাইয়ে নিট তৈরিপোশাক রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়েছে। তবে ওভেন পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ কম রপ্তানি হয়েছে। বছরের প্রথম মাসে কৃষিজ পণ্য লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়েছে। ৬৭ দশমিক ৫৪ মিলিয়ন ডলারের বিপরীতে ৭২ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন ডলার কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এক সময়ের প্রধান রপ্তানি পণ্য সোনালি আঁশ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি। জুলাইয়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়েছে। তথ্য বলছে, ৭৩ দশমিক ৭২ মিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ৬৫ দশমিক ৬৭ মিলিয়ন ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য।

রপ্তানি আয়ের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য রপ্তানির নতুন গন্তব্য সৃষ্টি কিংবা বিদ্যমান গন্তব্যগুলোকে কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া রপ্তানি পণ্যের সম্ভার বাড়াতে হবে। সর্বোপরি রপ্তানিমুখী উদ্যোগগুলোতে সরকারের প্রণোদনামূলক নীতি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। সরকার এবং রপ্তানিকারকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের রপ্তানি খাত সমৃদ্ধ হবে– প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দুটি রেকর্ড সেই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। সবদিক থেকেই সেরা স্থান অর্জন করুক বাংলাদেশের রপ্তানি খাত।

উষা রানী রায় : প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা কোল্লাপাথরের টিলায় শায়িত

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া বীর বিক্রম, বীর উত্তম ও বীর প্রতীকসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার কোল্লাপাথরের টিলার উপরে ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিসৌধ রয়েছে। প্রতিদিন এই সমাধিসৌধ দেখতে অনেক লোক ভিড় করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি উপজেলার নাম কসবা। কসবা পৌরসভা থেকে আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার পরেই নয়নপুর বাজার। সেখান থেকে নতুন পাকা সড়ক ধরে পূর্বদিকে এগোলেই বারেক ইউনিয়নের লাল মাটির টিলা ঘেরা গ্রাম কোল্লাপাড়া। এই গ্রামটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। এখানে একটি টিলার উপর শায়িত আছেন ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রয়েছেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, হাবিলদার, সুবেদার থেকে প্রকৌশলীও। এর মধ্যে দুজন বীর বিক্রম, একজন বীর উত্তম ও দুজন বীর প্রতীক রয়েছেন। নিজের ডায়রিতে লিখে রেখে সবার সমাধি চিহ্নিত করার কাজটিও করেন আব্দুল করিম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস ধরে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যাদের মরদেহ আনা সম্ভব হয়েছিল কেবল তাদেরই সমাহিত করা হয় কোল্লাপাথরের টিলায়। তবে সমাহিত তিনজনের পরিচয় আজও মেলেনি। কোল্লাপাথরে সমাহিত শহিদরা হলেন– সিলেটের হাবিলদার তৈয়ব আলী, ঠাকুরগাঁওয়ের সৈনিক দর্শন আলী, আর কে মিশন রোড ঢাকার জাকির নায়েকের হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফকরুল আলম, ফারুক আহম্মদ, মোজাহিদ নুরু মিয়া, নোয়াব আলী, আব্দুল ওয়াদুদ, আব্দুল কাইউম, ল্যাপ নায়েক আব্দুল খালেক, রফিকুল ইসলাম, মোরসেদ মিয়া, আবদুস সালাম সরকার, আমির হোসেন, তাজুল ইসলাম, শওকত, শ্রী পরেশ চন্দ্র মল্লিক, আবদুল আউয়াল, জাবেদ আহাম্মদ, আবদুর রশিদ, সিপাহী শহিদুল হক, সিপাহী আনোয়ার হোসেন, মতিউর রহমান ও আবদুল জব্বার, বগুড়ার ল্যান্স নায়েক আবদুস সাত্তার (বীর বিক্রম), কুমিল্লার সিপাহী আক্কাছ আলী, সিপাহী জসিম উদ্দীন, সিপাহী হুমায়ুন কবির, ল্যান্স নায়েক আজিজুর রহমান, তারু মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, ফরিদ মিয়া, সাকিল মিয়া, জামাল উদ্দিন ও সিপাহী আবদুল বারী খন্দকার, ময়মনসিংহের নায়েক মোজাম্মেল হক, নোয়াখালীর নায়েক সুবেদার মো. আবদুস সালাম (বীর বিক্রম), ফরিদপুরের সিপাহী মুসলিম মৃধা, শরিয়তপুরের প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, আবদুল কাসেম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী), মোশারফ হোসেন, নায়েক সুবেদার মইনুল হোসেন (বীর উত্তম), সিপাহী নুরুল হক, জাহাঙ্গীর আলম, আনসার ইলাহী বক্স পাটোয়ারী (বীর প্রতীক), নায়েক সুবেদার বেলায়েত হোসেন (বীর উত্তম), শ্রী আত্তরঞ্জন দে এবং অজ্ঞাত আরও তিনজন। ঐ সমাধিস্থলে থাকা নায়েক সুবেদার মইনুল ইসলামের নামেই ঢাকা সেনানিবাস এলাকার অতি পরিচিত মইনুল সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ইশরাত হক

কবিতাগুচ্ছ

অক্ষয় তুমি চিরদিন

আ. শ. ম. বাবর আলী

ওরা চেয়েছিল–
তোমাকে ওরা ভালোবাসতে দেবে না,
তোমাকে মহাসমুদ্র জেনে
শুকিয়ে দিয়ে মরুভূমি বানাতে চেয়েছিল তোমাকে।

তুমি এক সুদৃঢ় মজবুত রাজপথ–
যাকে ওরা পরিণত করতে চেয়েছিল
কণ্টকপথে।

তুমি এক অনন্ত ইতিহাস–
সে ইতিহাসের পাতাকে ওরা
টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল
মাতাল ঘূর্ণিবাতাসে।

সুউচ্চ কীর্তির মিনার তুমি–
কঠিন মিনারটাকে ওরা গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল
বঙ্গবন্ধু হে মহান নেতা,
ওরা তা পারেনি।

আজও তুমি মহাসমুদ্র হয়ে আছো
তোমার সৃষ্টির ভূ-ভাগে,
সুউচ্চ শ্রদ্ধার মিনার
আমাদের বুকের জমিনে।
বিশ্বসেরা ইতিহাস তুমি
বিশ্বের মুক্ত মানবের।

বঙ্গবন্ধু, আজও তুমি অক্ষয়
আমাদের বুকের শিলালিপিতে,
এমনি অক্ষয়িত রবে
তুমি চিরদিন।

বঙ্গবন্ধু আমার বাংলাদেশ

বশিরুজ্জামান বশির

কোনো রাজনৈতিক দলকে ভালোবাসি না মনের মতো
কিছু কিছু দলের লক্ষ্য আদর্শ নীতি ভালো লাগে;
ভালোবাসি আমার প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে
বঙ্গবন্ধু আমার আদর্শ আমার দেশপ্রেম আমার বাংলাদেশ।

আজ স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান
বেঁচে থাকলে আমি কর্মহীন জীবন কাটাতাম না;
বঞ্চিত হতাম না আমার অধিকার থেকে...
ফিরে পেতাম আমার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রিয় স্বাধীনতা।

আগস্টের এলিজি

ইউসুফ রেজা

আজকে আগস্ট এই বর্ষায়
আজকে শোকের দিন
যতই কাঁদি শোধ হবে না
পিতা তোমার ঋণ।

খুন হয়েছে জাতির আশা
স্বাধীন বাংলাদেশ
খুনি কিছু আজও আছে
হয়নি তারা শেষ।

জাতির পিতার হত্যাকারী
মানবতার নামে
বন্ধু দেশেই লুকিয়ে আছে
নিমন্ত্রিত খামে।

সভ্য বলে দাবি করে
খুনিকে দেয় ঠাঁই
দুইমুখী এই বখিল বন্ধু
আর প্রয়োজন নাই।

বাংলাদেশ নামক সংসার

সেহাঙ্গল বিপ্লব

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙে রেডিও বার্তার শব্দে
প্রচার করছে বার বার একটি ঘোষণা
ঘুম ঘুম চোখে অস্পষ্টত কানে ভেসে আসছিলো
শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ।
উঠে দ্রুত হাত-মুখ ধুতে গিয়ে সবাই অবাক!
বঙ্গোপসাগরে পানির বদলে থৈ থৈ রক্ত স্রোত
প্রবাহিত হয়ে খালবিল-নদীনালা এমনকি
শহরের ট্যাপকল, গ্রামের পুকুর সবকিছু
রক্তে ভরপুর। লোকালয়ে মানুষের চোখ ফেটে
গড়িয়ে পড়ছে ঘন থিকথিক শোকার্ত রক্তাশ্রু।
যেদিকে তাকাই শুধু রক্ত আর রক্ত, এত রক্ত
পৃথিবীর কোনো সাগরে ভাসতে কেউ কি দেখেছো?

সেই দিন ভোরে গান গায়নি বাংলার কোনো পাখি
উড়ন্ত বাতাস ছিলো থমথমে, জেগেছিলো সূর্য
অনিচ্ছায়। শোকের মাতম ভাসছিলো মেঘে মেঘে।
বাংলাদেশ নামক সংসার আজ পিতা-মাতাহারা
আগ্নেয়গিরি বুকে নিয়ে ভাইহারা দুই বোন শুধু
পিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র জপে চলেছেন–
তাঁরা প্রকৃতির থেকে পেয়েছেন শক্তি বেঁচে থাকার
তাঁরা জনতার থেকে পেয়েছেন শক্তি ভালোবাসার।

হত্যার পাপ সর্বগ্রাসী

শাহরুবা চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু হত্যার পাপ আজ সর্বগ্রাসী
গিলে খাচ্ছে সবকিছু শুভ, কল্যাণ
স্বাধীনতার সকল বৈভব।
কতগুলো পশ্বধম জীব।
কিলবিল করছে চারদিকে
বড়ো পোয়াবারো এখন ওদের
এখন ওরা বড়ো বেশি তেজী বেপরোয়া
উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে ওরা আজ হরেকরকম।

হত্যার পাপ ওদের পুঁজি
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওদের নাগাল পায় না
ওরা বড়ো বিধ্বংসী, ছারখার করে দিতে পারে
সভ্যতার সকল বিকাশ এক লহমায়।

কখন আসবে ওদের দুঃসময়
আমি সেই অপেক্ষায় আছি
কার ডাকে আসবে ওদের দুর্দিন
আমি সেই মানুষটির অপেক্ষায় আছি
কারা ভাঙবে ওদের ঘৃণ্য বড়াই
আমি সেই মানুষগুলোর একজন হতে চাই।

ত্রয়ী কবিতা

অলিতাজ মনি

মুজিবের ফসল– আদর্শের মনোবল
গাছের পাতায় কবির খাতায় প্রাণ মাতায় অতল কোলাহল
হৃদয় তাঁর উজাড়– আকাশভরা শস্যের সমস্ত স্বপ্নের ফসল
তিনি সাধনে মানুষ-মনে আকাঙ্ক্ষার জমিনে– আদর্শের মনোবল।

বাংলাদেশ নিবেশ
যুগে যুগে ভুগে; সার্বভৌমত্ব অমরত্ব যোগে– জাতি তবে মাতি; বোধ-ক্রোধ পণের পেশ
শহর, সমাজ নাড়িয়ে– ভেদাভেদ ছেদ ছাড়িয়ে– পাথরে অকাতরে– এমন এক নিবেশ
দুচোখে বুকের কোখে বদ্বীপ সুরুজ সরূপ লালটিপ; শেখ মুজিব বেশ–'বাংলাদেশ'।

বিভববন্ধুর বিজয়
আমরণ– বিলিয়ে দিয়ে জীবন–খোঁজ আরোজ– প্রাণঅবনী– অম্লান অক্ষয়
বাংলার স্বাধিকার সজীব– মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব– ইতিহাসের বপন উদয়
বিভববন্ধুর বিজয়– অনন্তর অন্তর বঙ্গবন্ধু বিস্ময়ের পরিচয়।

মহাকবি মহান সাধক বঙ্গবন্ধু

আতিক আজিজ

কলিজা তোমার বড়ো ছিল অনেক অনেক বড়ো
অতল মহাসাগর যেমন বিশাল বিশাল বড়ো ।
হিমালয়ের মতো ছিল উঁচু তোমার মাথা
কণ্ঠে তোমার ছিল কেবল সর্বহারার গাথা।

ভালোবাসার প্রদীপ তুমি জ্বাললে ঘরে ঘরে
মহাকবি মহান সাধক হলে জানি না কার বরে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ডাকলে সবায় রণে
বাঁধলে সবায় বাহু ডোরে গভীর আলিঙ্গনে।

মন্ত্র দিলে দীক্ষা দিলে স্বাধীনতার জন্য
বাংলাদেশের জনগণে করলে তুমি ধন্য।
তোমার ডাকে দিলো সাড়া মুক্তিপাগল জাতি
স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে ঘুচলো অমারাতি।

সকল শোষণ করলে খতম মরলো শোষক ধুকে
নতুন সমাজ গড়লে তুমি বাংলাদেশের বুকে ।
ষড়যন্ত্র হলো খাড়া তোমার চারধারে
কলিজা তোমার ঝাঁঝরা হলো রাতের অন্ধকারে।

তোমার শোকে হয়ে আছে চোখের জলে নদী
তোমার লাগি বঙ্গমাতা কাঁদে নিরবধি।

হে প্রিয় মুজিব

প্রজীৎ ঘোষ

তোমার কণ্ঠ আজও বাজে
ষোলো কোটি বাঙালির কানে কানে;
সে কণ্ঠের ধ্বনিতে হৃদয়ে সজীবতা আনে
মাতৃভূমির মৃত্তিকা রক্ষায়
বিলিয়ে দিতে চায় মন-প্রাণ-দেহ
তোমার সেই দীপ্ত বজ্রকণ্ঠে ছিল
এমন উদাত্ত আহ্বান; মায়া-মমতা-স্নেহ।

হে প্রিয় মুজিব!
তুমি একটি দিন নও
নও একটি রাত কিংবা প্রভাত।
তুমি বাংলার ইতিহাস
তুমি বীর বাঙালির ইতিহাস
তুমি নিজেই এক দিগ্বিজয়ী বীর
তুমি প্রাণের মানুষ আজও ষোলো কোটি বাঙালির।

নিবন্ধ

যুব উন্নয়নে সরকারের নানামুখী কর্মসূচি

ইসমত আরা

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ১২ই আগস্ট। ১৯৯৯ সালে ১২ই আগস্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক যুব দিবস ঘোষণা করে। জাতিসংঘ ২০০০ সালের ১২ই আগস্ট প্রথম এই দিবসের স্বীকৃতি দেয়। সেই দিনেই প্রথমবারের মতো দিবসটি পালিত হয়। দিবসটির উদ্দেশ্যে যুবসমাজকে ঘিরে সাংস্কৃতিক এবং আইনি সমস্যাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ প্রতিবছর আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। যুবকদের কথা, কাজ ও উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি তাদের জীবনের অর্থবহ দিক ও সর্বজনীনতা সবার কাছে তুলে ধরা এবং স্বীকৃতি দেওয়া এ দিবসের মূল লক্ষ্য। যুব দিবসের সাথে বেশ কিছু সংগঠনের নাম চলে আসে, যারা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে যুবকদের ব্যক্তি ও পেশাগত উন্নয়ন নিয়ে। তেমনি একটি নাম বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)। বাংলাদেশ বিওয়াইএলসি যাত্রা শুরু করে ২০০৯ সালে। আর বাংলাদেশের তরুণদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে বিওয়াইএলসি অফিস অব প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওপিডি)। পর্যায়ক্রমে দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং নিয়োগদাতাদের সঙ্গে তরুণদের সংযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের চাকরির সুযোগ তৈরিতে ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ওপিডি। এখন পর্যন্ত ওপিডি প্রায় ৪ হাজার ৬ শতাধিক তরুণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং যাদের মধ্যে থেকে ১৫ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থীর চাকরি বা কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ এখন নতুন কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মাট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি- এই চারটি মূলভিত্তির উপর গড়ে উঠবে ২০৪১ সালে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তিনি যুবসমাজের উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেন, এর গুরুত্ব বর্তমানে অধিক। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর যুবভাবনা ও চিন্তাচেতনা প্রাসঙ্গিক। যুবসমাজ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর অনেক ভাবনা ও স্বপ্ন ছিল। তিনি ভাবতেন যুবমাজের প্রতিটি সদস্যকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তারাই হয়ে উঠবে এক আর্দশবান মানুষ। এই আদর্শ মানুষ বলতে তিনি এমন ব্যক্তিকে বোঝান, যে উন্নত মানবিক গুণাবলি–ধারণ করবে ও অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য হবে। সামাজিকভাবে যা কিছু ভালো, শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও কল্যাণকর সবকিছুই থাকবে যুবসমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ যুব ও তরুণসমাজ। বর্তমানে লোকসংখ্যার হিসাবে দেশে সাড়ে ৪ কোটির বেশি তরুণ ও তরুণী রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সিদের 'যুব' বলে অভিহিত করা হয়। যুবসমাজকে একটি জাতির স্তম্ভ, সভ্যতা–সংস্কৃতি ও উন্নয়নের কারিগর বলা যেতে পারে। যুবকরা শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী, জাগ্রত জ্ঞানের অধিকারী এবং রাষ্ট্র সমাজের পরিবর্তন- সংগ্রামের অগ্রনায়ক। বর্তমান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজন প্রযুক্তি–রোবটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ও আইওটি জানা দক্ষ যুবসমাজ গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম চেতনার ও মনোভাবের প্রজন্ম যেন গড়ে না উঠে, সে ব্যাপারে অধিক সচেতন প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর ভাবনা খাঁটি-দক্ষ, সৎ ও বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমী যুবসমাজই হলো দেশের সম্পদ। ২০১৮ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে যেসব অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে– ২০১৭ সালে প্রণীত জাতীয় যুবনীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন পৃথক যুববিভাগ একটি গবেষণাকেন্দ্র গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি। যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও চলমান জাতীয় সেবা কর্মসূচির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ সব আন্দোলন–সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এ দেশের যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এ দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি, তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামেও তারা নিরলসভাবে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাপী

'কোভিড–১৯' মহামারি সময়েও আমাদের যুবসমাজের কর্মস্পৃহা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সচল রেখেছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ইতোমধ্যে যুবকদের জন্য অনেক সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে কারিগরি শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। তরুণদের চাকরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে যুবকদের উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ব্যাংকের সহায়তায় প্রশিক্ষিত যুবকদের জন্য বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০' শিরোনামে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষে উপলক্ষে প্রশিক্ষিত যুবকদের পণ্য বিক্রির জন্য যুব ব্র্যান্ড, ১০০টি যুব শপ ও যুব কিচেন এবং ১০০টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কৃর্তক ২৯,১১,৯৯৬ জন বেকার যুবককে ৮৩টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ৪০৩,৭৯৪ জনকে ১০২৬,২৮,৩৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব নারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে ৭,২৮,৭৫০ জন যুবক সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যুব সংগঠন আইন ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করে এর আওতায় নিবন্ধিত ৭,১০৫টি যুব সংগঠনকে যুবকল্যাণ তহবিল থেকে ১৫,৫১৮৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে উচ্চতর গবেষণা ও মূল্যায়ন, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিগ্রি দেওয়া, যুবকদের জন্য একটি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণ ও যুববিষয়ক নীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মাট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে। সবাই প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করতে হবে। সব কিছুই ই-গর্ভনরের মাধ্যমে করতে হবে। ২০৪১ সালে নাগাদ আমরা তা করার সক্ষম হব এবং সেটি মাথায় রেখে কাজ চলছে। আমাদের যুব সম্প্রদায় যত বেশি এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা শিখবে, তারা তত বেশি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

চলছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়কাল, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছেশক্তি, কারখানা উৎপাদন, কৃষিকাজসহ যাবতীয় কাজকর্ম ও বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও পিছিয়ে নেই প্রস্তুতি চলছে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির অবদান রাখতে পারে স্মাট বাংলাদেশ তৈরিতে। নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে যুব ও যুবনারীদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। তাই যুবসমাজের ওপর অনেক দায়িত্ব, তরুণ্যের শক্তিই বাংলাদেশের উন্নতি। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের ২০১৮-এর নির্বাচনি ইশতাহার, তরুণ যুবসমাজের এই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সবার।

ইসমত আরা: প্রাবন্ধিক

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই আগস্ট ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২৩ প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আটটি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর সর্বোচ্চ পাঁচজন নারীকে এই পদক দেওয়া হয়। বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় নারী ফুটবল দল এবং চার বিশিষ্ট নারীকে এ বছরের পদকের জন্য নির্বাচিত করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সাফ ফুটবল ২০২২-এ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় জাতীয় নারী ফুটবল দল এবারের এই পদক লাভ করে। এ ছাড়া যে চার বিশিষ্ট পদকপ্রাপ্ত নারী হলেন– রাজনীতিতে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন (মরণোত্তর); শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় নাসিমা জামান ববি ও অনিমা মুক্তি গোমেজ এবং গবেষণায় ডা. সেঁজুতি সাহা (মলিকুলার বায়োলজিস্ট)।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক অনুদান ও সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন। সারা দেশের ৪ হাজার ৫০০ দুস্থ নারীর মধ্যে সেলাই মেশিন এবং ৩ হাজার দুস্থ নারীর প্রত্যেককে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দুই হাজার করে টাকা প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নিবন্ধ

মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই

জাহানারা বেগম

মাতৃদুগ্ধ সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত। মায়ের বুকের দুধ জন্মের পর শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবজাতক শিশুর জন্য মায়ের বুকে হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ দুধ সৃষ্টি করে রাখেন, যা নবজাতক শিশুর জন্য বিশেষ উপযোগী। মাতৃস্নেহ এবং মাতৃদুগ্ধ প্রত্যেকটি সুস্থ শিশুর বেড়ে ওঠার পরিপূরক। শিশুরা যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে এক্ষেত্রে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের দুধ প্রত্যেকটি শিশুর অধিকার। মায়ের দুধ খেলে শিশুর শারীরিক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মায়ের দুধ যে প্রত্যেক শিশুর জন্য অতি জরুরি এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার।

'মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিত করি, কর্মজীবী মা-বাবার সহায়ক পরিবেশ গড়ি'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রায় ১২০টি দেশের সঙ্গে আমাদের দেশেও পালিত হয়েছে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। ১৯৯২ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তাহটি উদ্‌যাপন শুরু হয়। বাংলাদেশে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর সপ্তাহটি পালিত হয়ে আসছে। ২০১০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ জাতীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে জাতীয় পুষ্টি সেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি মাসব্যাপী পালন করে থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠের প্রথম ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দিলে গর্ভফুল পড়তে সহজ হয়, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাতৃদুগ্ধ পানে শিশু যেমন সুস্থ-সবল হয়ে বেড়ে ওঠে, তেমনি তার সর্বোচ্চ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হয়। উপকৃত হন প্রসূতি নিজেও। মাতৃদুগ্ধ পান করালে বছরে আট লাখের বেশি শিশুর জীবন রক্ষা পাবে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। মাতৃদুগ্ধ পান করালে মায়েদের স্তন ক্যান্সার, ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার, টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা ও এর তীব্রতার ঝুঁকি কমাতে পারে বুকের দুধ। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং কানের প্রদাহ কমায় এটি।

জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দাঁত ও হাড় গঠন ও মজবুত করে মায়ের বুকের দুধ। হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখাসহ প্রায় সব ভিটামিন ও খনিজের জোগান দেয় বুকের দুধ। আমাদের দেশে এখন হাজার হাজার মা বুকের দুধ পান করানোর পরিবর্তে বাজারের কৃত্রিম দুধ পান করান। এটা কাম্য নয়। মায়ের দুধ হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার এবং পানীয়। এর বিকল্প নেই।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ মায়ের দ্রুত আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে বুকের দুধের বিকল্প নেই। ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং ট্রেন্ডস ইনিশিয়েটিভ (ডাব্লিউবিটিআই) এ বছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহকে সামনে রেখে করোনাকালে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে। এ লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো– মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য আইনের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা; শিশুর খাবার ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিধি ও অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য কোম্পানিগুলোর ডিজিটাল বাজারজাতকরণ কৌশল চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ করা; ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়ক পরিবেশ ও মাতৃত্ব সুরক্ষা (ছুটি, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ভাতা প্রদান) নিশ্চিত করা; মাতৃদুগ্ধদানের সুরক্ষা, প্রচার ও সমর্থনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ; স্বাস্থ্য সেবা কর্মীর কাউন্সেলিং ও মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য আইনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হলো– মায়ের দুধ খাওয়ানোর ৪৭ সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা; মায়ের দুধ খাওয়ানোকে জনস্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোচ্চ সফলতার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা। আমাদের দেশে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত অবহেলিত, কারণ ধরেই নেওয়া হয় যিনি জন্ম দিলেন তিনি তো স্তন্যদান করবেনই, এটা তার একার দায়িত্ব এবং অবধারিত ব্যাপার। বিষয়টি এত সহজ নয়, আর সে কারণেই দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত অনেক সদ্য প্রসূতির সন্তান মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে! মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত শিশুরা বিভিন্ন রোগে সহজে আক্রান্ত হয় এবং কখনো কখনো অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আইবিএফএএন-এর তথ্য অনুযায়ী, শিশুকে মায়ের দুধ না

খাওয়ালে নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১৫ গুণ, ডায়রিয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১১ গুণ, শিশুদের অপুষ্টি ও অন্যান্য কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১৪ গুণ এবং জন্ডিস, কানপাকা ও পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণসহ ডায়রিয়ার শঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শারীরিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, বয়সের তুলনায় ওজন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘস্থায়ী রোগের (ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্থূলতা) ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

একসময় বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধ ছিল শিশুর অপরিহার্য প্রাকৃতিক খাদ্য। ফর্মুলা দুধের আবির্ভাবের আগে সব মা-ই অন্তত দুই বছর পর্যন্ত নিজের বুকের দুধ খাওয়াতো শিশুকে। কিন্তু ফর্মুলা দুধ বা খাদ্য উদ্ভাবন ও বিপণনের পর অনেকেই বড়ো বড়ো শিশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির অপপ্রচারে প্রভাবিত হয় এবং মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে অনেক শিশুকে ফর্মুলা দুধ খাওয়াতে শুরু করে। এটি শুধু বৈশ্বিক নয়, বাংলাদেশেরও চিত্র। তদুপরি, দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে নানা বদল ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে বিপুলসংখ্যক নারী। অর্থকরী পেশায় যুক্ত হয়েছে অনেকে। কর্মজীবী বা শ্রমজীবী এসব নারীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে অবিচ্ছিন্নভাবে ছয় মাস দুধ পান করানো সম্ভব নয়। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও প্রতিকূল পরিবেশে শিশুকে যথাযথভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করানো যায়ও না। বলা চলে, নানা কারণে দেশে অনেক শিশুই মায়ের বুকের দুধ খাওয়া এবং এর বিপুল সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি রেখে সবখানে মাতৃদুগ্ধদানে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

দেশে শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি সমস্যা হলো– খর্বত্ব, কৃশকায়ত্ব এবং ওজনস্বল্পতা। এগুলো পুষ্টিহীনতার-ই মূর্ত প্রকাশ। বাংলাদেশে এককভাবে মায়ের দুধ পানের হার (ইবিএফ) ৫৫ শতাংশ। স্তন্যদানে সঠিক উপায় এবং অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারিত সময়ব্যাপ্তি অনুসরণ না করায় অনেক শিশুই মায়ের দুধের সর্বোচ্চ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং দুধ পানের লক্ষণীয় মাত্রায় উন্নীত করা এবং সঠিক কায়দায় মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বেড়েছে। ফর্মুলার চেয়ে মায়ের দুধ কতটা ভালো, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে অনেক দেশে মাতৃদুগ্ধ পানের হার (ইবিএফ) বেড়েছে। ইবিএফ হারে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে– ক্রোয়েশিয়া ৯৮ দশমিক ১৩ শতাংশ, রুয়ান্ডা ৮৬ দশমিক ৯৩, চিলি ৮৬ দশমিক ৫০, বুরুন্ডি ৮২ দশমিক ৩৫ এবং শ্রীলঙ্কা ৮২ শতাংশ। দেশগুলো ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রসহ সব ক্ষেত্রে শিশু ও মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপনসহ শিশুকে মায়ের কাছাকাছি রাখার সুব্যবস্থা করেছে।

রূপকল্প–২০২১ ও রূপকল্প–২০৪১-এর মাধ্যমে সরকার দেশকে এমন জায়গায় নিতে চায়, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারে। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীতকরণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা, কর্মজীবী মায়েদের ভাতা প্রদান, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, বিনামূল্যে মাতৃত্ব সেবাদান ও শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য টিকা ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মা ও শিশুমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। নতুন প্রজন্মকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা একটি কর্মক্ষম জাতি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। তাই জন্মের পরপরই শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মায়ের দুধ পান নিশ্চিত করা শুধু সরকার নয়, আমাদের সকলের দায়িত্ব। মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিত করার সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিবারের সব সদস্যের শিক্ষা ও সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। প্রসূতি মায়ের পরিবারকে স্তন্যপানের উপকারিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পাশাপাশি প্রসূতি মা যেন সুস্থভাবে স্তন্যপান করাতে পারেন, সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। এ সব বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং আমরা একটি মেধাবী ও সুস্থ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব।

জাহানারা বেগম: প্রাবন্ধিক

মুজিবপিডিয়ার মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্ঞানকোষ মুজিবপিডিয়ার মোড়ক উন্মোচন করেন। ১০ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মোড়ক উন্মোচনের সময় মুজিবপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক কামাল চৌধুরী, সম্পাদক ফরিদ কবির, নির্বাহী সম্পাদক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বইটির স্পন্সর প্রতিষ্ঠান দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন। এতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবন এবং তার সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঠিক তথ্য-উপাত্ত।

উল্লেখ্য, মুজিবপিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত বঙ্গবন্ধুর পরিবার সংক্রান্ত ভুক্তিগুলো সংশোধন ও সম্পাদনা করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বইটির প্রকাশক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার সার্কেল বাংলাদেশ লিমিটেড। পরিবেশক আগামী প্রকাশনী। এতে ৫৯১টি ভুক্তি ও প্রায় ৭৫০টি ঐতিহাসিক আলোকচিত্র রয়েছে। বইটির ভুক্তি লিখেছেন ৯৭ জন লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক। বইটি ভুক্তি যাঁরা লিখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– তোফায়েল আহমদ, জাতীয় অধ্যাপক একে আজাদ খান, শেখ হাফিজুর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, হারুন-অর-রশীদ, মুনতাসীর মামুন, আতিউর রহমান, মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর, আবুল মোমেন প্রমুখ।

প্রতিবেদন: নওশান আহমেদ

পনেরো আগস্ট

আবুল হোসেন আজাদ

শ্রাবণের মেঘ জমেছে আবার আকাশে
দিনের সূর্য রাতের নক্ষত্রপুঞ্জ মেঘের শরীরে
ঝর ঝর বৃষ্টি অবিরাম, কদম বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে
ডানা ঝাপটায় ভেজা পাখি বারংবার
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে পানি গড়ায় সাগরের সীমানায়।

এমনি এক শ্রাবণের শেষ ভোরে
মুয়াজ্জিনের ফজরের আজানের প্রহরে
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শহিদ হলেন
বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির দোতলার সিঁড়ি পথে
রক্তের স্রোত বয়ে গেল বাংলার সবুজ জমিন ছুঁয়ে
বঙ্গোপসাগরে।

পনেরো আগস্ট ফিরে এলে
সাড়ে ষোলো কোটি শোকার্ত মানুষ বেদনায় নীল হই
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আর নেই
কে বলে তিনি নেই? তিনি আছেন
বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে
সবুজ শ্যামলের নীবিড় সান্নিধ্যে
আছেন পাখির গানে রাখালের বাঁশির সুরে
বাউলের সংগীতে।

পাপিষ্ঠ ঘাতকেরা পারেনি তাঁরে দাবায়ে রাখতে
যতদিন বাংলাদেশ বাঙালি ফুল পাখি থাকবে
তিনিও থাকবেন সবার হৃদয়তন্ত্রীতে।

শোকের ছায়া

মোল্লা আলিম

পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তরের শোকের এই দিন
সাক্ষী মাটি এই বাংলার হবে না বিলীন।
জেনে গেল বিশ্ববাসী শোকের এই ব্যথা
মুজিবের রক্তে লেখা ইতিহাসের পাতা।
শত্রুর গুলি বিন্ধে বুকে হয়নি মুজিব শেষ
মানচিত্র হলো আঁকা রক্তে বাংলাদেশ।
কতিপয় বিপথগামী শত্রুর মুখে ছিল হাসি
প্রায়শ্চিত্ত করল তারা পড়লো গলায় ফাঁসি।
আমরা বহু কষ্টে দিন কাটি বাংলার দুঃখে
মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘুমায় সুখে।
বাংলাদেশের যত মানুষ সবাই বাংলাদেশি
সবাই গাই– বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর

সবুজ শামীম আহসান

বঙ্গবন্ধু মানে
আমাদের আত্মপরিচয়ের বিশ্বাসী বাতিঘর।
হাজার বছরের বাঙালির
জাতিসত্তা বিকাশের কারিগর।
মানবিক নেতা বিশ্বস্ত সারথি
আপনার আপনজন।
বঞ্চিত জাতির প্রেমিকের নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

পরাধীন পরানের দশদিকে যে সময়
সর্বনাশের জটিল জাল।
তখন তোমারি প্রাজ্ঞতার হাতে ধরলে
আমার বাংলা নৌকার হাল।
তোমার ঐ সম্মোহনী সুরে
বাঙালির বিবেক দাঁড়ালো ঘুরে।
বীর রক্তে জন্ম নিল নতুন পৃথিবী
সময়ের কোলজুড়ে।

সততা-নিষ্ঠার আর এক নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।
তোমারি আদর্শ
বাঙালির দেহ-মননে আজও রয়েছে বহমান।
তোমার ঐ প্রেরণার পায়ে পায়ে
হেঁটে হেঁটে বাঙালি পেয়েছে অধিকার।
তুমি শোষিতের বন্ধু বিশ্ববন্ধু
বাঙালির স্বাধিকার।

তুমি আমাদের জীবনের স্বরলিপি
বাঙালির অহংকার।
তুমি চিরচেনা মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর
তুমি মহান চিরন্তন চিরভাস্বর।

প্রিয় মুজিব

আলমগীর কবির

গণজোয়ার বইতে থাকে দেশের প্রতি টানে,
শব্দগুলো বারুদ হয়ে শত্রুর বুকে হানে।

দিনটি ছিল সাদামাটা ছিল না জমকালো,
সেই ভাষণের দীপ্তি দেখে শত্রুরা চমকালো!

ভাষণ ছিল গর্জে উঠার ভাষণ স্বাধীনতার,
কবি এসে বাঁধ দিয়েছেন ভেঙে নীরবতার!

সেই সে ভাষণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দিলো এঁকে,
সাগর নদী মুগ্ধ এমন গণজোয়ার দেখে!
দিকে দিকে স্বপ্ন গোলাপ যায় ছড়িয়ে ঘ্রাণ,
দিনে দিনে মুজিব হলেন বাংলাদেশের প্রাণ!

পরাধীন সময়ের এলিজি

শেখ ফয়সল আমীন

স্বদেশের রূপ-রস-গন্ধ হঠাৎ বদলে যেতে
আমরা দেখেছি
দেখেছি বঙ্গবন্ধুবিহীন এক অশুচি ভোর
সেদিন রাজপথ থেকে মেঠোপথ কোথাও মানুষ ছিল না
ছিল শুধু সাজোয়া যান আর মানুষ খেকোদের লেফট-রাইট।

অতঃপর পিতা হারানো এক সর্বস্বান্ত জাতিকে
আমরা দেখেছি
দেখেছি ক্রমশ হারাতে– আমাদের জাতিসত্তা, জাতি ইতিহাস
সেদিন বঙ্গ ললাটে জাতিগৌরবের রাজটিকা ছিল না
ছিল শুধু জাতিমুক্তি আর ইতিহাস হরণের করাল গ্রাস।

স্বাধীনতা দিবসকে 'আজাদি দিবস' হতে
আমরা দেখেছি
দেখেছি কীভাবে খবরের কাগজে, সভা সেমিনারে ইতিহাস বদলায়
একাত্তরের বীর বাঙালি আর অদম্য বাংলাদেশের চিরচেনা রূপ
সেদিন ছিল না
ছিল শুধু চাটুকার, উমেদার, প্রবঞ্চক আর একদল দেশদ্রোহী।

স্বাধীনতাদ্রোহীরা কীভাবে কালের স্রোতে সব কিছু বদলে ফেলে
আমরা তা দেখেছি
দেখেছি বাতিল হতে মুক্তিযুদ্ধের দালাল আইন
সেদিন এদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল না
ছিল শুধু রেডিও বাংলাদেশ আর ঘৃণ্য ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ।

প্রিয় জাতীয় সংগীত বদলের সর্বাত্মক চেষ্টাও
আমরা দেখেছি
দেখেছি মাতৃভূমির নাম পরিবর্তনে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র
সেদিন দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না
ছিল শুধু ধর্মের নামে রাজাকার আলবদর আলশামসদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া।

অতঃপর এক দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ প্রদক্ষিণ করে
আমরা ফিরেছি
আমরা ফিরেছি
কালবৈশাখি রাত কাটিয়ে এক অনির্ণীত সকালে
এ সকাল যেন নতুন দিনের সূচনা
এ সকাল যেন অসুর বধের প্রেরণা।

তারপর বহুক্রোশ পথ পেরিয়ে
সহস্র শ্বাপদের বুক মাড়িয়ে
দেখছি হৃদয়চক্ষু মেলে
পিতা হত্যার বিচারে শুচি হতে বাংলার মাটিকে।

পিতা হারানোর শোক

মিজানুর রহমান মিথুন

প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমার মন কাঁদে। আমার প্রাণ কাঁদে।
পিতা হারানোর বিষাদ মেঘে ভরা থাকে আমার চারপাশ।
তোমরা কেবল ১৫ই আগস্ট এলে পিতা হারানোর শোকে কাঁদো।
নানা আনুষ্ঠানিকতায় পার করো দিনটি।
আর আমার কাছে প্রতিটিক্ষণ পিতা হারানোর বেদনায় দুঃখ ভারাক্রান্ত।
আমি পিতা হারানোর শোকে নির্জীব নিশ্চল।
আমি পিতাকে খুঁজি,
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে,
আমি পিতাকে খুঁজি বৃক্ষ বনবনানীর প্রগাঢ় সবুজে সবুজে।
পিতাকে খুঁজি আমি দোয়েলের শিসে,
হাজার পাখির কলতানে,
রেসকোর্সের বিশাল প্রান্তরে,
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে।
আমি পিতাকে খুঁজি সমগ্র বাংলাদেশে।
তোমরা শুধু ১৫ই আগস্ট এলে
পিতা হারানোর শোকে কাঁদো,
আর আমি পিতা হারানোর শোকে মূহ্যমান।
আমি শোকে পাথর।
কোনো সান্ত্বনায় পিতা হারানোর শোক কিছুতেই মুছতে পারছি না।

মুজিব আঁকি

শাকিব হুসাইন

আইফা সোনা আঁকছে ছবি
সাদা মেঘের দেশে
রং দিয়ে যায় হরেক প্রকার
রংধনুটা এসে।
রংধনু কয়, আইফা সোনা
আঁকতে পারো আঁকো
রং দেবো তো ইচ্ছেমতো
আঁকতে তুমি থাকো।

আইফা সোনা করছটা কী?
ডাক দিয়ে কয় রবি–
যাঁর নামেতে বাংলাদেশটা
আঁকছি তাঁরই ছবি।
মেঘবুড়ো কয়, আর কতক্ষণ
এমনি করে থাকি?
চুপ থাকো না চুপ থাকো না
আমি মুজিব আঁকি।

সেবক হিসেবে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সেবা সহজ, সুলভ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আরও বেশি জনবান্ধব ও আন্তরিক হতে হবে। ২২শে জুলাই জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ সব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে ১৩ই জুলাই ২০২৩ বঙ্গভবনে ডেনমার্কের বিদায়ি রাষ্ট্রদূত Winnie Estrup Petersen সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, জনপ্রশাসনের সকল কর্মবিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, সেবা সহজীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি উদ্ভাবনী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমৃদ্ধ সোনার বাংলা নির্মাণে তিনি যুবদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বিশ্বায়ন-তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার পথ ধরে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পেতে ই-কমার্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা গ্রহণের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, আধুনিক কারিকুলাম প্রণয়ন, সনদায়ন এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। ১৫ই জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ সব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ি সাক্ষাৎ

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ১৩ই জুলাই বঙ্গভবনে বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন। সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন গণমাধ্যমকে জানান, সফল দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি।

ডেনমার্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে প্রথম উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি ডেনমার্কের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম। এ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ একযোগে কাজ করতে পারে। গত বছরে 'সাসটেইনেবল অ্যান্ড গ্রিনফ্রেম ওয়ার্ক এনগেজমেন্ট' স্বাক্ষরিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ডেনমার্ককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রপতি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ডেনমার্কসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও উন্নয়ন অংশীদারসহ সবাইকে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার অনুরোধও জানান তিনি। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বদ্ধপরিকর। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স’কে প্রযুক্তির প্রসারে কাজ করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স’কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করছে। এর সুফল পেতে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। ৩রা আগস্ট ২০২৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স’-এর প্রথম বৈঠকে তিনি এ সব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলছেন তার জন্য দেশের নাগরিকদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যেখানে সকল মানুষ ডিজিটাল ডিভাইস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে জানবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা আগস্ট ২০২৩ তাঁর কার্যালয়ে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স’-এর সভায় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় রচিত ‘লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

নতুন প্রজন্মকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা ও প্রযুক্তি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে এবং ধাপে ধাপে কী করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের জনশক্তি আমাদের বড়ো শক্তি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জনশক্তি প্রস্তুত করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না, যেখানে মানুষ উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করবে। স্মার্ট বাংলাদেশে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য।

ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে

দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও প্রয়োজন। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এটি বিকশিত হতে পারে না। বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমি বলব, আমাদের এখানে এখন ব্যাবসাবাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা অনেক কিছু আমরা করে দিয়েছি। বেসরকারি খাত অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম সব জায়গায় তারাই (খেলোয়াড়রা) তুলে ধরতে পারবেন। সে ক্ষেত্রেও আপনাদের (ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা) এই সহযোগিতাটুকু দরকার। ৫ই আগস্ট রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) পুরস্কার ২০২৩ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, আপনারাও একজন ক্রীড়াবিদকে চাকরি দিতে পারেন বা আপনাদেরও একটা

ক্রীড়া সংগঠন থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রতিভা ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাদেশে। সেসব প্রতিভাগুলো আপনারা কুড়িয়ে আনেন ও তাদের একটু সুযোগ করে দেন। আপনারা দেখবেন, বাংলাদেশের জন্য এরাই সবচেয়ে বেশি সুনাম বয়ে আনবে। এ সময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও দুটি সংস্থাকে 'শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করেন। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ দেওয়া হয়। একই অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

রংপুরে ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও ৫টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারসহ আরও পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২রা আগস্ট রংপুর জিলা স্কুল মাঠে এক মহাসমাবেশ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এ সব প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। যেসব প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর জেলার বিট্যাক সেন্টার, রংপুর মেডিকেল কলেজের মহিলা হোস্টেল এবং বিএমডিএ'র আঞ্চলিক অফিস।

পঞ্চম ধাপে ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে পঞ্চম ধাপে আরও ৫০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ৩০শে জুলাই গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি তিনি যোগদান করে পঞ্চম পর্বে আটটি বিভাগের ৩৪টি জেলার এ মসজিদগুলো উদ্বোধন করেন। সারা দেশে ৯,৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৫৬৪টির মধ্যে নতুনগুলোসহ প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত ২৫০টি মসজিদ উদ্বোধন করেন। তিনি এর আগে ২০২১ সালের ১০ই জুন, ২০২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি, ১৬ই মার্চ, ১৭ই এপ্রিল এবং ৩০শে জুলাই– প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপে প্রতিটিতে ৫০টি করে মসজিদ উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণকাজ ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

এফএও সদর দপ্তরে বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ উদ্বোধন

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সদর দপ্তরে এফএও মহাপরিচালক কিউ ডংইউ-এর উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টা ও দেশে কৃষি খাতে 'সবুজ বিপ্লব' সূচনাকারী বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২৫শে জুলাই আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশ এফএও সদর দপ্তরে এই ছোট্ট অংশটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। এই আয়োজন সম্ভব করতে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী এফএও মহাপরিচালক ও তাঁর দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এফএওর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণকে নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্ত করাই বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম বহনকারী এই কক্ষটি উদ্বোধন উপলক্ষে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার গত সাড়ে ১৪ বছরে মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ফলে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২৪শে জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ সব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৪৯ লক্ষ মে. টন; যা ২০০৫-২০০৬ সালের মোট উৎপাদনের ২৩.২৯ লক্ষ মে. টন থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে সূচিত সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং আমাদের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশীয় সাফল্যের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ ৩য়। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টসিয়া উৎপাদনে ৮ম এবং ফিনফিস উৎপাদনে ১১তম স্থানে রয়েছে। ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য়।

বাংলাদেশের ইলিশ ও বাগদা চিংড়ি জিআই পণ্য হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে যা আমাদের জন্য গর্বের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আজ ৫২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৯ হাজার ৮৮১ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ'।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

কাঁটাতার পারেনি ছিঁড়তে নাড়ির বন্ধন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, সীমান্তের কাঁটাতার বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গকে বিভক্ত করলেও, আমাদের হৃদয় ও নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি। একই মাটির গন্ধ, একই নদীর জল, একই পাখির কলতান, একই মেঘমালার বৃষ্টি, একই সংস্কৃতিতে আমাদের জীবন। দক্ষিণ কলকাতার নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে ২৮শে জুলাই পঞ্চম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ৬ই জুলাই ২০২৩ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। এ সময় দুই বাংলার চলচ্চিত্রকাররা একসাথে কাজ করলে বাংলা চলচ্চিত্র বিশ্ব অঙ্গন দখল করবে, এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র এমন একটা মাধ্যম যা দেখে শত শত বছরের আগের অবস্থা জানা যায়, আবার ভবিষ্যতের ছবিও আঁকা যায়। সবার সহযোগিতায় বিগত বছরগুলোতে কলকাতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসব যেমন সফলতা পেয়েছে, এ বছরও তেমনি পাবে, আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা নয়। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা দুই বাংলার চলচ্চিত্র উৎসব। পঞ্চম বর্ষেও নিশ্চয়ই উৎসবের সিনেমা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আকৃষ্ট করবে। আমরাও চাই কলকাতার ছবি নিয়ে বাংলাদেশে উৎসব হোক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে কথাবার্তা চলছে। বাংলাদেশের সংসদ সদস্য এরোমা দত্ত, অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ, কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস, অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ, অভিনেত্রী পূর্ণিমা, অরুণা বিশ্বাস, নুসরাত ফারিয়া, গায়ক রূপঙ্কর বাগচী, প্রিয়াঙ্কা গোপ প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের আয়োজনে সেখানকার ঐতিহাসিক নন্দন-১ ও ২ প্রেক্ষাগৃহে ২৯শে জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত উৎসবে *হাসিনা-আ ডটার'স টেল*, *জেকে-১৯৭১*, *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, *লালশাড়ি*, *গেরিলা*, *দামাল*, *পরাণ*, *গুণিনসহ* মোট ২৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গণতন্ত্র ও সুখী সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে দুই ধাপ এবং সুখী দেশের সূচকে আমাদের সাত ধাপ অগ্রগতি প্রমাণ করে যে দেশে গণতন্ত্র সংহত হয়েছে, সুশাসন রয়েছে। ১০ই জুলাই রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের ৬৫ জনের মাঝে ৬৯ লাখ টাকার চেক বিতরণ করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ধারণাটি জননেত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত। তিনিই প্রথম জাতীয় প্রেসক্লাবে ঘোষণা দেন যে, মাঝে মধ্যে সহায়তা দেওয়ার চেয়ে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো উত্তম। তাঁর সেই চিন্তা থেকেই প্রথমে কল্যাণ তহবিল গঠন ও তারপর সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

গঠিত হয়। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আজকে সত্যিকার অর্থে দেশে যে সমস্ত সাংবাদিক কষ্টে থাকেন, দুর্ঘটনায় পতিত হন কিংবা নিহত হন, তাদের ও পরিবারের জন্য একটি ভরসার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিওর যাত্রা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই শুরু হয়েছে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালে ছিল ১০টি টেলিভিশন, এখন ৩৫টি টেলিভিশন সম্প্রচারে আছে, আরও ৭-৮টি সম্প্রচারের অপেক্ষায়। চারশো দৈনিক পত্রিকা ছিল ২০০৯ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি, এখন সাড়ে বারোশো দৈনিক পত্রিকা। সম্প্রচার হচ্ছে বেসরকারি এফএম ও কমিউনিটি রেডিও, প্রকাশিত হয় হাজার হাজার অনলাইন পত্রিকা। গণমাধ্যমের এই যুগান্তকারী বিকাশ জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সুখী দেশ সূচকে আমরা ৭ ধাপ এগিয়েছি উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সুখী সূচকে ভারত, পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে আমাদের অবস্থান এখন ৯৪তম। ভারতের অবস্থান ১৩৬তম, পাকিস্তানের ১২১তম, শ্রীলংকার অবস্থান ১২৭তম। এটি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুশাসনের প্রমাণ, গণতন্ত্রের অভিযাত্রার প্রমাণ। তিনি বলেন, আমাদের দেশে গণমাধ্যম অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, প্রয়োজন দায়িত্বশীলতার। আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাজ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন আছে, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতাও আছে। সেখানে একটি অসত্য সংবাদ পরিবেশনের কারণে ১৩০ বছর চলার পর বিশ্বখ্যাত পত্রিকা *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড* বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও আমাদের সরকারের নীতি যে, গণমাধ্যম অবাধ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমের কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন– স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতার দিকেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। তাহলেই গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র সংহত হবে, দেশ এগিয়ে যাবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় দেশ পৌঁছাবে।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭৪২ জন সাংবাদিকের অনুকূলে ট্রাস্ট থেকে ৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা এবং ২ হাজার ২৯৮ জনকে প্রধানমন্ত্রীর করোনাকালীন বিশেষ সহায়তা হিসেবে ২ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং সরকারকে

দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের পুনরুত্থানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদ। ৬ই জুলাই সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন, পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজী হায়াৎ, মহাসচিব শাহিন সুমন, সাংস্কৃতিক সচিব শাহিন কবির টুটুল, চলচ্চিত্র গ্রাহক সংস্থার সভাপতি আব্দুল লতিফ বাচ্চু, চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাস, সদস্য ইউনুস রুবেল, সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের সদস্য সচিব শাহ আলম কিরণ, এডিটরস গিল্ড সভাপতি আবু মুসা দেবু, চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস, প্রযোজক অপূর্ব রানা প্রমুখ সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র জগতের ঘুড়ে দাঁড়ানোর প্রেক্ষিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা দেন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

চলচ্চিত্র পরিষদ নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় বলেন, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আটটি এবং ঈদুল আজহার সময় পাঁচটি মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সারা দেশে দর্শকদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক সিনেমা হল খুলেছে। সরকার সিনেমা হল নির্মাণ ও সংস্কারে এক হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল দিয়েছে, বাণিজ্যিক সিনেমায় অনুদান দিচ্ছে। এ সবই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। এ জন্য আমরা মন্ত্রী ও সরকারকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

কাজী হায়াৎ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে 'চলচ্চিত্রের বন্ধু' আখ্যা দেন। সুদীপ্ত দাস সহজ ঋণে দেশব্যাপী সিনেমা হল গড়ে তুলতে অব্যাহত প্রচেষ্টার অঙ্গীকার করেন। ইলিয়াস কাঞ্চন ভালো কনটেন্ট নির্মাণের ও শাহিন সুমন বাণিজ্যিক সিনেমায় অনুদান বৃদ্ধির আহ্বান জানান। আবু মুসা দেবু তথ্য কমপ্লেক্সগুলোতে সিনেমা হল রাখার অনুরোধ জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী চলচ্চিত্র পরিষদের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভালো কাজের প্রশংসা হলে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ভালো কাজের প্রশংসা তেমন হয় না, কোনো ভুল হলে সেটি নিয়েই মাতামাতি হয়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি, সিনেমা হলের সংখ্যা একশোর নীচে নেমেছিল, এখন বেড়ে এক পর্দার সিনেমা হল আর সিনেপ্লেক্স মিলে প্রায় দুইশো হল চলছে। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্রের বড়ো সুহৃদ। চলচ্চিত্র শিল্পের এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে শুধু সরকারের সহযোগিতাই কাজ করেছে তা নয়, চলচ্চিত্র জগতের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এই শিল্পের সাথে থাকা, শিল্পকে ধরে রাখা, সিনেমা বানানো এবং লোকসান দিয়েও হল বন্ধ করে না দেওয়া এগুলো নিশ্চিতভাবে কাজ করেছে বলেন তিনি। তিনি বলেন, আমাদের পরিচালক, শিল্পী-কলাকুশলীরা বিশ্বমানের, অনেক আন্তর্জাতিক উৎসবে তারা পুরস্কৃত হয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বিশ্বাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া।

***বাংলাদেশ এট এ গ্ল্যান্স* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন**

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশ এট এ গ্ল্যান্স* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ৩রা জুলাই সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

বাংলাদেশ এট এ গ্ল্যান্স বইটি সম্পর্কে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এটি মূলত বিদেশে আমাদের মিশনগুলোর চাহিদা পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি তুলে

ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত আছে এটা অনেকেই জানে না। পর্যটন, ব্যাবসা বাণিজ্যসহ সবক্ষেত্রেই দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া এবং পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আলী সরকার বইটির মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

সবুজ কারখানার দেশ বাংলাদেশ

তৈরি পোশাকশিল্প দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে। দশ বছর আগে রপ্তানির প্রধান এ খাতে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে ২০০ ছুঁয়েছে। ৮ই আগস্ট পরিবেশসম্মত সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন বা লিড সনদ পেয়েছে আরও দুই পোশাক কারখানা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এ সনদ দেয়। এ দুই কারখানার মধ্যে একটি হলো- লিডা টেক্সটাইল অ্যান্ড ডাইং লিমিটেড অপরটি লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড।

এর আগে পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তা সাজ্জাদুর রহমান মৃধার হাত ধরে ২০১২ সালে প্রথম পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার যাত্রা শুরু দেশে। পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে স্থাপিত কারখানাটি হলো 'ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও।' এরপর একটার পর একটা সবুজ পোশাক কারখানা গড়ে উঠছে বাংলাদেশে। সবশেষ দুই কারখানা মিলে ২০০টি সবুজ কারখানার সনদ পেল দেশ।

সবুজ কারখানা মানে বিশ্ব বাজারে ক্রেতার কাছে আলাদা কদর। এ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গায়ে গ্রিন ট্যাগ সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ এ পণ্যটি কোন সবুজ কারখানায় উৎপাদিত। এ পণ্যটি বিদেশি ব্র্যান্ড এবং ক্রেতার কাছে আস্থা বাড়ে। সবুজ কারখানায় উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষিতেও এগিয়ে থাকা যায়। মূল কথা সনদ দেশ ও পোশাকখাতের ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়াতে সহায়তা করে।

ইউএসজিবিসি সনদপ্রাপ্ত আরএমজি কারখানার সংখ্যা বাংলাদেশে দুইশ ছুঁয়েছে। ইউএসজিবিসির সনদ পাওয়া সবুজ কারখানার মধ্যে রয়েছে প্লাটিনাম ৭৩টি, গোল্ড ১১৩টি, সিলভার ১০টি ও সার্টিফাইড চারটি। এতে সর্বমোট গ্রিন ফ্যাক্টরি বা সবুজ কারখানার সংখ্যা দাঁড়ালো ২০০টিতে। বিশ্বের সেরা কিছু কারখানার আবাসস্থল বাংলাদেশ, বিশ্বের শীর্ষ ১৫টি লিড গ্রিন কারখানার মধ্যে ১৩টি বাংলাদেশে অবস্থিত।

অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা

তৈরি পোশাকের অন্যতম অপ্রচলিত বাজার অস্ট্রেলিয়া। দেশটিতে ২০৩২ সাল পর্যন্ত পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণের পর আরও ছয় বছর বর্তমানের রপ্তানি সুবিধা অব্যাহত থাকবে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় বর্ধিত সময়ের জন্য এ শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পেতে উৎস বিধির কোনো শর্ত পতিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকছে না বাংলাদেশের জন্য এটা অনেক বড়ো সুখবর। কারণ এখন পর্যন্ত অন্য কোনো দেশ এত বড়ো মেয়াদে শুল্কমুক্ত সুবিধা ঘোষণা করেনি। এদিকে গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ায় পোশাক রপ্তানি ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। মোট ১১৬ কোটি ডলারের পোশাক গেছে দেশটিতে। আগের অর্থবছরের চেয়ে বেড়েছে ৪২ শতাংশেরও বেশি। আগের অর্থবছর এর পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ডলারের কিছু বেশি। আর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৭৩ কোটি ডলার।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তরুণ প্রজন্মই হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের মূল শক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্মই হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষ জনশক্তি। ২৯শে জুলাই রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রথমবারের মতো দুই দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্মার্ট দেশ হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্ম মেধাবী এবং তাদের নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে। তারা প্রতিটি উপজেলায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তিনি উল্লেখ করেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লক চেইন, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, মেডিকেল স্ক্রাইব, সাইবার নিরাপত্তার মতো উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে।

সরকারপ্রধান বলেন, তাঁর সরকারের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচটি ইউনিকর্ন (কমপক্ষে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি স্টার্টআপ কোম্পানিকে ইউনিকর্ন বলা হয়) এবং ২০৪১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে জুলাই ২০২৩ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সফল তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে স্টার্টআপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন –পিআইডি

সালের মধ্যে ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ তৈরি করতে সহায়তা করা যেখানে প্রতিটি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ সময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'ভারত-বাংলাদেশ স্টার্টআপ ব্রিজ' নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ স্টার্টআপ ফান্ড'-এর পাশাপাশি 'স্মার্ট বাংলাদেশ এক্সিলারেটর' উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

স্টার্টআপরাই স্মার্ট বাংলাদেশের মেরুদণ্ড হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, স্টার্টআপরাই স্মার্ট বাংলাদেশ ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হবে। ৩০শে জুলাই রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত স্টার্টআপ বাংলাদেশ সামিটের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে আগামী বছর থেকে নিয়মিত বাংলাদেশে স্টার্টআপ সামিট করা হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া স্টার্টআপ ব্রিজ, কোটি টাকার ফান্ড অব ফান্ড এবং স্মার্ট বাংলাদেশ এক্সেলেটর নজর কেড়েছে। এসব ঘোষণা দিয়ে তিনি স্টার্টআপদের এগিয়ে নিয়েছেন। আমাদের তরুণরা তাদের উদ্ভাবনী ধারণা দিয়ে বেশ ভালো করছে।

আমাদের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে

আগামী ১৮ বছরে আমাদের একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে বলে জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (আইসিটিডি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, ১৮ বছর আগেও দেশে পর্যাপ্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা ছিল না, আর দামও ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। কিন্তু সরকারের যথার্থ প্রয়াস এবং গ্রামীণফোনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা, যার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন দেশের ১২.৭ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। ৩০শে জুলাই গ্রামীণফোনের অফিসে জিপি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এক মাস্টারক্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রাক-নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তিনশোরও বেশি তরুণ শিক্ষার্থী জিপি অ্যাকাডেমির এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। মাস্টারক্লাসে প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের মূল চারটি ভিত্তি স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি নিয়ে আলোচনা করেন। যথাযথ ভবিষ্যৎমুখী দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কীভাবে নিজেদের ডিজিটাল রূপান্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও প্রস্তুত করে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে তরুণদের দিক নির্দেশনা দেন।

উল্লেখ্য, মেধাবী তরুণদের দক্ষতার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণফোনের জিপি অ্যাকাডেমি প্ল্যাটফর্ম। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ওই মাস্টারক্লাসের আয়োজন করা হয়।

আইটি প্রকৌশলীসহ দক্ষ জনশক্তি নিতে চায় জাপান

আইটি প্রকৌশলীসহ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান। একইসঙ্গে বাংলাদেশে স্টার্টআপ ও গবেষণা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগ করতে চায় দেশটি। ২৩শে জুলাই সোনারগাঁওয়ে জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ইয়াসুতোশি নিশিমুরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠককালে এই আগ্রহের কথা জানান। জাপানের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের আইসিটি রপ্তানি থেকে ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে অর্জিত ১২০ মিলিয়ন ডলারের বাজারকে বিলিয়ন ডলার এ উন্নীত করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।

এ সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জাপানে রপ্তানি বাড়াতে আইটি বা আইটিইএস রপ্তানি পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে সরকার আগামী তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লাখ শিক্ষার্থীকে এআই, বিগ ডাটা, আইওটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, সেমিকন্ডাক্টর প্রভৃতি

উদীয়মান প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেবে । এই প্রশিক্ষিত জনশক্তি জাপানের বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন প্রতিমন্ত্রী।

বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে বলেন, ৭টি বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এরমধ্যে সফটওয়্যারের পর বাংলাদেশের হার্ডওয়্যার খাতে এবং সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগে জাপানের আগ্রহ রয়েছে।

এছাড়াও দেশটি জনঘাটতি মেটাতে বাংলাদেশের ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের এআই, রোবটিক্স মাইক্রোচিপ ডিজাইন এবং সাইবার সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তা পূরণ করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি হাইটেক পার্কে বাংলাদেশ-জাপান আইটি ইনস্টিটিউট ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এসএসসি ২০২৩-এর ফল প্রকাশ

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাসের হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। পাসের হারে পিছিয়ে আছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। অন্যদিকে ফলাফলের সর্বোচ্চ সূচক জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক দিয়ে সবার উপরে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। ২৮শে জুলাই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে ১১ শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২০ লাখ ৪১ হাজার ৪৫০ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১৬ লাখ ৪১ হাজার ১৪০ জন। এদিন বেলা ১১টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলন করে ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তার আগে সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে একযোগে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাঁর কার্যালয়ে ২৮শে জুলাই ২০২৩ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ –পিআইডি

এবার ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন গড় পাসের হার ৮০ দশমিক ৯৪ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ২২০ জন। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৯০ দশমিক ১৮। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৩১১ জন। সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৬ দশমিক শূন্য ৬, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৪৫২ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৭ দশমিক ৫৫। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ হাজার ৩০৩ জন। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৮৭ দশমিক ৮৯ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ হাজার ৮৭৭ জন। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪২ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৬২৩ জন। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৭ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৬১৭ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ২৯ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৪৫০ জন। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৬ দশমিক ৮৭, আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৪১০ জন। ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৯ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ১৭৭ জন পরীক্ষার্থী।

পাঠদান অনুমতি পেল আরও তিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন তিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। আগামী বছর থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন ও অংশগ্রহণমূলক পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো : কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর। ১লা আগস্ট ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত অনুষদ, বিভাগ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিশন সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীরের সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া, নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করবে তার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে ইউজিসি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নাট্যোৎসবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশের মৌসুমী মৌ

মরক্কোর কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত ৩৫তম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যোৎসবে অংশ নিয়ে সেরা নারী অভিনেত্রীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশনের (ডুমা) সদস্য মৌসুমী মৌ। ২৪ থেকে ২৯শে জুলাই মরক্কোর দ্বিতীয় হাসান ইউনিভার্সিটি অব কাসব্লাংকায় এই উৎসব হয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশনের (ডুমা) প্রযোজনা 'অস্বীকৃতি' দিয়ে তিনি এ পুরস্কার পান।

নাট্যোৎসবে 'অস্বীকৃতি', 'চেয়ার: দ্য সাইন অব পাওয়ার', 'ভালোবাসা' এবং 'অতঃপর, সুবোধ পালাবে না আর'-চারটি স্কেচ নিয়ে ৪০ মিনিটের প্রযোজনাটি পরিবেশন করেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। মাইম অ্যাকশন ও মূকাভিনয়ের একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম ইনস্টিটিউট অব মাইম অ্যান্ড মুভমেন্টের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়েছে প্রযোজনাটি। মৌয়ের হাতে সেরা পারফরমারের পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় পাশে ছিলেন বাংলাদেশ দলের দলনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক তাওহিদা জাহান। এ উৎসবে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও সৌদি আরবের শিল্পীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনী শেষে ইতালি, ফ্রান্স, মরক্কো, তিউনিসিয়া, জার্মানি ও সৌদি আরবের বিভিন্ন নাট্যদল বাংলাদেশের মূকাভিনয় শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'অস্বীকৃতি' মঞ্চে আনা হয় ২০১৭ সালে। ওই বছর ঢাকার কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে এটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়। এরপর দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া মিলিয়ে এই প্রযোজনা দুই শতাধিক মঞ্চায়ন হয়েছে। 'অস্বীকৃতি' রচনা ও নির্দেশনায় আছেন শাহরিয়ার শাওন। অভিনয় করেছেন মৌসুমী মৌ, মো. মেহেদী হাসান সোহান, শাহরিয়ার শাওন এবং মীর লোকমান। উল্লেখ্য, এ উৎসবে মৌসুমী মৌয়ের সাথে যুগ্মভাবে সেরা পারফরমার নির্বাচিত হয়েছেন মরক্কোর সামিয়া। 'ব্ল্যাক লাইন' নামের একটি প্রযোজনায় অভিনয় করে তিনি এই পুরস্কার পান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো নৌবাহিনীর প্রধান হচ্ছেন একজন নারী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো প্রধান হিসেবে একজন নারীকে পেতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২২শে জুলাই অ্যাডমিরাল লিসা ফ্রাঞ্চেটিকে এই পদের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। *রয়টার্সের* খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিসা ফ্রাঞ্চেটিকে মার্কিন নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। মার্কিন সামরিক বাহিনীতে লিঙ্গ বাধা দূর হওয়ার পর এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এর আগে প্রথম নারী হিসেবে মার্কিন পরিষেবার কমান্ড এবং জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের সদস্য হয়ে লিঙ্গ বাধা দূর করেছিলেন লিসা। বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ক্যারিয়ারজুড়ে অ্যাডমিরাল লিসা অপারেশনাল এবং নীতি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক দক্ষ। তিনি মার্কিন নৌবাহিনীতে চার-তারকা অ্যাডমিরালের পদ অর্জনকারী দ্বিতীয় নারী। লিসা মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান হওয়ার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি সামরিক পরিষেবার নেতৃত্ব দেবেন। তিনি আটজন শীর্ষ সামরিক নেতার একটি গ্রুপে যোগদান করবেন, যারা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাপানি কোম্পানি বিনিয়োগে আগ্রহী

বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে, তবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশ সরকারকে ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও উন্নত করার অনুরোধ জানিয়েছেন জাপানের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ইয়াসুতোশি নিশিমুরা। ২৩শে জুলাই ঢাকায় 'বাংলাদেশ-জাপানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আগামী ৫০ বছরের জন্য : বাংলাদেশের শিল্পের মানোন্নয়ন' শীর্ষক দিনব্যাপী সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) যৌথভাবে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ইয়াসুতোশি নিশিমুরা, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ২৩শে জুলাই ২০২৩ সোনারগাঁও হোটেলে JETRO-এর সহযোগিতায় 'Japan-Bangladesh Relationship for the next 50 years' সামিটে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

জাপানের অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে। ৩০০টিরও বেশি জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে, আরও কোম্পানি বাংলাদেশে আসতে চায়। জ্বালানি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনে জাপান বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চায় উল্লেখ করে ইয়াসুতোশি নিশিমুরা বলেন, পরবর্তী স্তরের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মানোন্নয়নে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিগত ৫০ বছরের সম্পর্কের আলোকে আমাদের আগামী ৫০ বছরের দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে।

আগামী বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষরে আশাবাদ ব্যক্ত করে ঢাকা সফররত এই মন্ত্রী বলেন, এলডিসি তালিকা থেকে বের হওয়ার আগেই ইপিএ চুক্তি হলে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে না। এখন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাপান বাংলাদেশের মেগাপ্রকল্পে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, জাপান সরকার এ অগ্রযাত্রায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বলেও জানান মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচল আবার শুরু

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচল আবার শুরু হলো। ১লা আগস্ট প্রথম ট্রেন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে আসে। দীর্ঘদিন পর এ রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় আনন্দিত যাত্রীরা।

নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশন মাস্টার কামরুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে জানান, আগে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে মেইল ট্রেন চলত, তার ভাড়া ছিল ১৫ টাকা। এখন উন্নত করে এ রুটে কমিউটার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে, যার ভাড়া ২০ টাকা। আর কমিউটার ট্রেনের টিকিট আগে থেকেই ২০ টাকা নির্ধারণ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ট্রেনে যাত্রীদের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। গেন্ডারিয়া ট্রেনলাইনের কাজ

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৭ই জুলাই ২০২৩ আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬-এর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে মেট্রো ট্রেন চলাচল পরীক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

শেষ হলে ১৬ জোড়া ট্রেন চলাচল শুরু হবে। গেন্ডারিয়া স্টেশনে লাইনের সংস্কারকাজ চলমান থাকায় ট্রেনের লাইন পরিবর্তন করা যায় না। রেল কর্তৃপক্ষ সে হিসাব মাথায় রেখে ট্রেন চলাচলের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে।

উল্লেখ্য, পদ্মা সেতুর রেললাইন স্থাপন ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ডাবল লাইন মেরামতের কাজ করতে গত বছরের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়। গত ২৫শে জুলাই রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশন পরিদর্শন করে ১লা আগস্ট থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন।

আগারগাঁও-মতিঝিল পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেল চলাচল

৭ই জুলাই আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয়। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে আগারগাঁও থেকে মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল উদ্বোধন করেন। এ সময় সেতুমন্ত্রী বলেন, অক্টোবরের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৮শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ঢাকায় দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল উদ্বোধন করার সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি নতুন যুগে প্রবেশ করে। এরপর উত্তরা-আগারগাঁও রুটে মেট্রোরেলের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। পরে আগারগাঁও-মতিঝিল সেকশন চলতি ডিসেম্বরে চালুর ঘোষণা দেয় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। এমআরটি কর্তৃপক্ষ আশা করছে, মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ ২০২৫ সালের জুন মাসে শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ২৪শে জুন এমআরটি লাইন-৬ নামে পরিচিত মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণ উদ্বোধন করেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

৩৪টি দেশে ২৭০০ টন আম রপ্তানি

এ বছর জুলাই মাস পর্যন্ত দুই হাজার ৭০০ টন আম রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় এক হাজার টন বেশি। গত বছর এক হাজার ৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছিল। গত বছর ২৮টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছিল, এ বছর ৩৪টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ১২৫৬ টন, ইতালিতে ২৯৬ টন, সৌদি আরবে ২৬০ টন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৩৭ টন, কাতারে ১১১ টন, সিঙ্গাপুরে ৫৫ টন, সুইজারল্যান্ডে ১৪ টন, জার্মানিতে ৭০ টন, ফ্রান্সে ৮৫ টন, সুইডেনে ৬৫ টন, কুয়েতে ২১৮ টন, কানাডায় ৪০ টন। ৪ঠা আগস্ট কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়। ২০১৭-২০১৮ সালে মাত্র ২৩২ টন, ২০১৮-২০১৯ সালে ৩১০ টন, ২০১৯-২০২০ সালে ২৮৩ টন, ২০২০-২০২১ সালে ১৬৩২ টন, ২০২১-২০২২ সালে ১৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাট উৎপাদনে বাম্পার ফলন

চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। এবার জেলাজুড়ে পাট উৎপাদনে বাম্পার ফলন হয়েছে। পাটের ফলন ভালো হওয়ায় হাসি ফুটেছে পাট চাষিদের মুখে। এখন চলছে পাট কাটা, পাট পঁচানো ও শুকানোর কাজ। এবার বাজারে পাটের দরও বেশ ভালো । ফলে পাট চাষিদের মধ্যে আবার নতুন করে বেশি জমিতে পাট চাষ করার আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। আগামী মৌসুমে আরও বেশি হেক্টর জমিতে পাট চাষ বাড়বে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি বিভাগ ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায়, চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৪ হাজার ১৮৯ হেক্টর জমিতে পাট আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর আবাদ হয়েছে ৪ হাজার ১৯২ হেক্টর জমিতে। গত বছরের তুলনায় এবার ২১৩ হেক্টর বেশি পাট আবাদ হয়েছে। জেলায় বেশি পাট উৎপাদন হয় নাসিরনগর, সরাইল, নবীনগর, বিজয়নগর ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলায়। উৎপাদিত পাট জাতের মধ্যে রয়েছে দেশি, তোষা ও কেনাফ জাতের পাট। তাই চলতি মৌসুমে জেলায় পাটখড়িসহ প্রায় ৬০ কোটি টাকার পাটের আঁশ উৎপাদিত হবে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ।

পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে

শরীয়তপুর জেলায় এবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৬৯ হাজার ৭১০ মেট্রিক টন পাট উৎপাদন হবে বলে আশা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর শরীয়তপুর। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী যার বাজারমূল্য ৪৮৮ কোটি টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর শরীয়তপুর সূত্র জানায়, জেলার ছয় উপজেলায় চলতি ২০২২-২০২৩ খরিপ-১ মৌসুমে পাট আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩০ হাজার ৫০০ হেক্টর। আবহাওয়া পাট আবাদের অনুকূলে থাকায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আবাদ হয়েছে ৩০ হাজার ৭১০ হেক্টর। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৮ হাজার ৯৫২ মেট্রিক টন থাকলেও ফলন অনুযায়ী ৬৯ হাজার ৭১০ মেট্রিক টন পাওয়ার আশা কৃষি বিভাগের। বর্তমান বাজার অনুযায়ী (প্রতি মণ ২৮০০-৩০০০ টাকা) যার বাজারমূল্য ৪৮৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। আবাদকৃত জাতের মধ্যে রয়েছে দেশি (সিজিএল-১) ৩০ হাজার ৫০০ হেক্টর, ভোষা (রবি-১, অ-৯৭/৯৮ ও জেআরো ৫২৪) ২১ হাজার ৮০০ হেক্টর, মেসতা (এএইচএস-২৪ ও বিজেআরাই-৩) এক হাজার ৮৮০ হেক্টর এবং কেনাফ (এইচসি-২ ও ডিজেআরআই-৪) তিন হাজার ৯৮০ হেক্টর।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্যতিক্রমী আশ্রয়ণ প্রকল্প

কক্সবাজার সদরের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন 'ব্যতিক্রমী' আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বে এ ধরনের বড়ো আশ্রয়ণ প্রকল্প থাকার কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন সেখানে বসবাসরত মানুষজন। উপকারভোগীরা জানান, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে

আশ্রয়ণ প্রকল্প

তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। সরকার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে আশ্রয় না পেলে জীবন বাঁচিয়ে টিকে থাকাটাই তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আফজাল হোসেন জানান, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২০টি ভবন নির্মিত হয়েছে। ৬০০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনে ডেঙ্গুর প্রকোপ

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। সেই সঙ্গে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনাও এর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। ২৪শে জুলাই ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'পানি স্যানিটেশন ও জলবায়ু পরিবর্তনে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব এবং করণীয়' শীর্ষক সভার আয়োজন করে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্য রুরাল পুওর-ডরপ এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাহফুজ কবীর। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণার তথ্য তুলে ধরে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়াচ্ছে বলে জানা গেছে। এক ঋতুর সঙ্গে আরেক ঋতুর যে পার্থক্য, বাংলাদেশে তা বদলে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা। মৌসুম হোক বা না হোক, ডেঙ্গুর মতো বাহকনির্ভর রোগের প্রকোপ বাড়ছে শহর এলাকায়। এই গবেষণা বলছে, আর্দ্রতা কমে আসার পাশাপাশি তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে দেশের রাজধানীসহ অন্যান্য শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। জলবায়ু যেভাবে বদলে যাচ্ছে, তাতে জনস্বাস্থ্যের ওপর এরই মধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গত কয়েক বছরে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতা হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়েছে। জলবায়ুর অসংগতির সঙ্গে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব এবং পজিটিভ কেসও বেড়েছে। আবহাওয়ার অবস্থা ডেঙ্গু রোগের সঙ্গে যুক্ত। কারণ এডিস ইজিপ্টির বৃদ্ধি এবং জীবনচক্র বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে হয়ে থাকে। এছাড়া ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত সাহায্য করেছে বলেও মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেল ২২ হাজার ১০১টি পরিবার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম। বাকি জীবন-জীবিকা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। আমরা চাই, এখান থেকে আপনারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। ৯ই আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন উপজেলার সুবিধাভোগীদের মাঝে বাড়িসহ জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই আগস্ট ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১২ জেলাকে ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা এবং ২২ হাজার ১০১ পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করেন –পিআইডি

তিনি আরও বলেন, এ কাজটি শুরু করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় এটি করেছিলেন। তাঁর কাজটিই আমরা এখন চালু রেখেছি। বাবা নেই, যাকে পোড়াগাছায় আশ্রয়ণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতও নেই। নিশ্চয়ই আমার বাবা জান্নাত থেকে এই কাজটি দেখছেন, খুশি হচ্ছেন। আমরা চাই, একটি মানুষও যেন অযত্নে অবহেলায় না থাকে, যে মানুষগুলোকে আমার বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাবা-মা ভাইবোন সব হারিয়েছি। ১৯৮১ সালে এসে এই দেশের মানুষকেই আপনজন হিসেবে পেয়েছি। তাদের মাঝে হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে খুঁজে পেয়েছি। আমার তো আর কিছু পাওয়ার নেই। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছি। দরিদ্র্য অসহায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও নতুন ঘর করে দিচ্ছি।

এবারে ২২ হাজার ১০১টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও ১২টি জেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হলো। এরই মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১টি জেলার আরও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হয়। যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৩৩৪টি এবং এই ১২টি জেলাসহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১টিতে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে বেশি সিনেমা হলে সুড়ঙ্গ

এবারের ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে নির্মাতা রায়হান রাফি পরিচালিত সুড়ঙ্গ সিনেমা। দেশে মুক্তির সময় থেকেই শোনা যাচ্ছিল ভারতেও মুক্তি পাবে ছবিটি। বাংলাদেশের ২৮টি সিনেমা হলে মুক্তি পায় সিনেমাটি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ২৯টি হলে দেখা যায় ছবিটি। বাংলাদেশে মুক্তির আগে থেকেই সিনেমাটির পোস্টার নিজেদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করে আসছিল ভারতের প্রযোজনা সংস্থা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এসভিএফ। তখন থেকেই সবাই ধারণা করে ছবিটি মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গের হলগুলোতেও। ২১শে জুলাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গজুড়ে মুক্তি পায় সুড়ঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি উপলক্ষে সম্প্রতি সুড়ঙ্গ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করেছে- এসভিএফ। এর আগে নির্মাতা রাফি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, দেশ কাঁপিয়ে এবার কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে সুড়ঙ্গ। তার মতো কানাডা, আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় রিলিজের চেয়েও বাংলা ছবি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি দেওয়াটা বেশি আনন্দের। কারণ হিসেবে নির্মাতা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বাজারটা পুরোটাই বাংলার বাজার। সেখানে আমাদের সিনেমার চাহিদা ব্যাপক।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম প্রয়াণ দিবস

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন তিনি। একাধারে তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ, চিত্রশিল্পী-গল্পকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত মৌলিক কবিতাগ্রন্থ ৫২টি, উপন্যাস ১৩টি, ছোটোগল্পের বই ৯৫টি, প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ ৩৬টি, নাটকের বই ৩৮টি।

পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ-বাঙালির বাংলা ক্যালেন্ডারের দুটো মুখস্ত করা দিন। একটি দিন জন্মের আর একটি মৃত্যুর। আর এ দুটো দিন মানেই রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্য ও কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাইশে শ্রাবণ কবির ৮২তম প্রয়াণ দিবস। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জীবদ্দশায় বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে বিচরণ করেন তিনি। আর এই বাইশে শ্রাবণ বিশ্বব্যাপী রবি ভক্তদের কাছে একটি শূন্য হবার দিন। রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যের বিশাল একটি অংশে যে পরমার্থের সন্ধান করেছিলেন সেই পরমার্থের সঙ্গে তিনি লীন হয়েছিলেন এইদিন।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষা নিয়ে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ নিয়ে লিখেছেন। তাতে ধরা পড়ে শ্রাবণ-বর্ষণের বহুমাত্রিক রূপ। তবে শ্রাবণের দিকেই কবির নজর ছিল বেশি।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়

আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। দুই ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জিতে হোয়াইট ওয়াশ করল টাইগাররা। ১৬ই জুলাই সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান করে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। জয়ের জন্য বৃষ্টি আইনে বাংলাদেশের টার্গেট দাঁড়ায় ১৭ ওভারে ১১৯ রান। ব্যাট করতে নেমে ৫ বল আগেই ৬ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। এই সিরিজ জয় এশিয়া কাপের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

বাংলাদেশের মেয়েদের ঐতিহাসিক জয়

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ নারী দল। এই স্বল্প পুঁজি নিয়ে ভারতকে হারাতে বোলারদের করে দেখাতে হতো বিশেষ কিছু। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে জ্বলে উঠলেন মারুফা আকতার ও রাবেয়া খাতুন। তাদের নৈপুণ্যে ওয়ানডেতে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক প্রথম জয়ের স্বাদ নিলো টাইগ্রেসরা।

১৬ই জুলাই মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ভারতকে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৪০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস হেরে ব্যাটিংয়ে গিয়ে ৪৪ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে এক ওভার বাকি থাকতে ১৫২ রানে অলআউট হয় তারা। এরপর সফরকারীদের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৫৪ রানের। তবে স্বাগতিকদের বোলিং তোপে ৩৫.৫ ওভারে মাত্র ১১৩ রানে থামে দলটির ইনিংস।

ওমানকে হারালো বাংলাদেশ

ইমার্জিং এশিয়া কাপে ওমানের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৫ই জুলাই কলম্বোয় নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ওমানকে আট উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তানজিম হাসান সাকিবের চার উইকেটে ওমান মাত্র ১২৬ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে তানজিম হাসানের ৬৮ এবং মোহাম্মদ নাঈমের অপরাজিত ৪৭ রানে ২০১ বল বাকি থাকতে জয় পায় বাংলাদেশ।

১৮ পদক জয় বাংলাদেশের

থাইল্যান্ডে পাঁচটি স্বর্ণসহ ১৮টি পদক জিতেছেন বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দোকারা। ১লা ও ২রা জুলাই থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে দুদিনের হিরোজ তায়কোয়ান্দো আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি স্বর্ণ, চারটি রুপা ও নয়টি ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ।

র‍্যাংকিংয়ে ফারজানা নাহিদার ইতিহাস

ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী দলের প্রথম জয় এবং এই সংস্করণে নিজেদের প্রথম সেঞ্চুরি। ভারতের বিপক্ষে ১-১ সমতায় শেষ হওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রাপ্তি কম নয়। এই সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে এবার মেয়েদের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার ফারজানা হক ও নাহিদা আক্তার। ২৫শে জুলাই প্রকাশিত মেয়েদের ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বকালের সেরা অবস্থানে উঠে এসেছেন ফারজানা। বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে একই কীর্তি গড়েছেন নাহিদা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন অধ্যাপিকা পান্না কায়সার

আফরোজা রুমা

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, শিশু-সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য পান্না কায়সার চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৪ঠা আগস্ট রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

১৯৫০ সালের ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন পান্না কায়সার। তাঁর পারিবারিক নাম সাইফুন্নাহার চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষে বেগম বদরুন্নেসা কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তিনি। ১৯৬৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কজন সদস্য শহীদুল্লা কায়সারকে তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফেরেননি। স্বামী শহীদুল্লা কায়সারের হাত ধরেই আধুনিক সাহিত্য ও রাজনীতির সঙ্গে পান্না কায়সারের পরিচয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি শিশু-কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর আসর'-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি এই সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদে তিনি সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন।

১৯৯১ সালে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন পান্না কায়সার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো: *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে* (১৯৯১), *মুক্তি* (১৯৯২), *নীলিমায় নীল* (১৯৯২), *হৃদয়ে বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *মানুষ* (১৯৯৪), *অন্য কোনখানে* (১৯৯৪), *তুমি কি কেবলই ছবি* (১৯৯৪), *রাসেলের যুদ্ধযাত্রা* (১৯৯৪), *দাঁড়িয়ে আছ গানের ওপারে* (১৯৯৪), *আমি* (১৯৯৪), *না পান্না না চুনি* (১৯৯৫), *অন্যরকম ভালোবাসা* (১৯৯৫), *সুখ* (১৯৯৫) ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পান্না কায়সার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ পেয়েছিলেন। পান্না কায়সারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনও শোক জানিয়েছে। ৪ঠা আগস্ট বাদ জুমা রাজধানীর গুলশানের আজাদ মসজিদে পান্না কায়সারের প্রথম জানাজা হয়। এরপর বেলা পৌনে তিনটার দিকে রাজধানীর নিউ ইস্কাটনের বাসার সামনে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা হয়। পরে তাঁর মরদেহ বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ৬ই আগস্ট বেলা ১১টায় পান্না কায়সারের মরদেহ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে নেওয়া হয়। বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

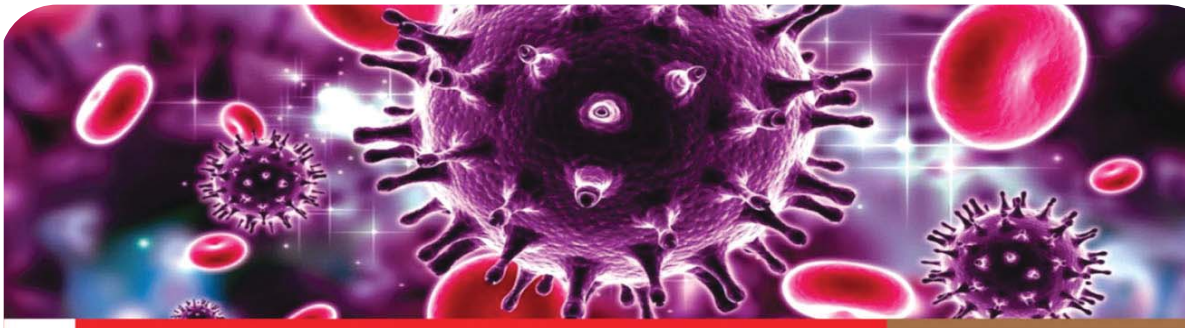

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 02, August 2023, Tk. 25.00

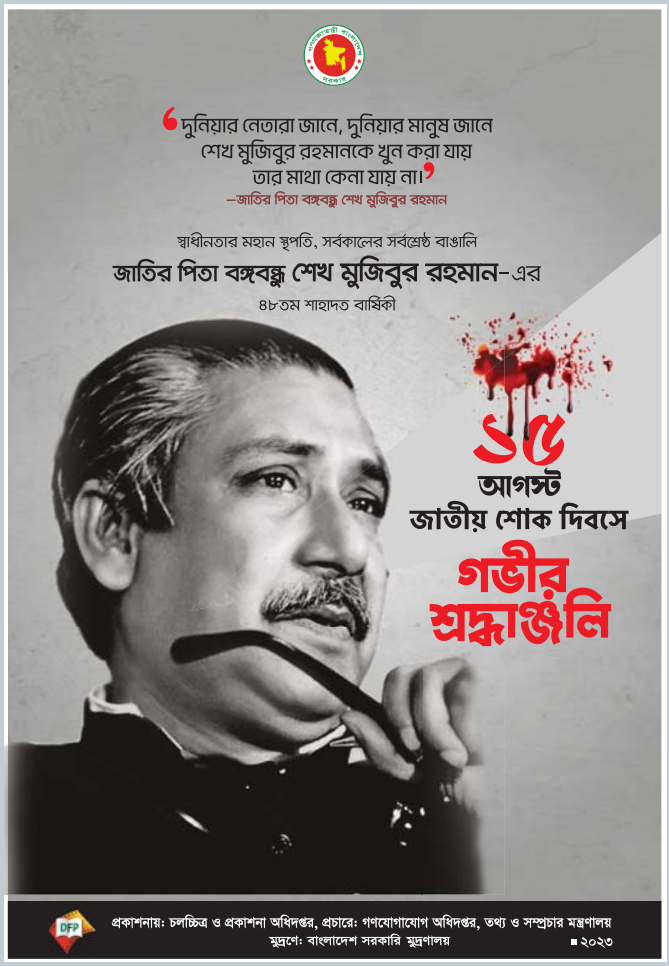

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd